উত্তর খণ্ড

ভাবশরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগের দুই খণ্ডে আলোচিত ক্রাইম কাহিনী ছাড়া সাধারণ সাহিত্যে এমন কিছু ক্রাইম ভাবনার ও ক্রাইম কর্মের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যা আলোচিত ক্রাইম কাহিনীর মতো হলেও তা ক্রাইম কাহিনীর মতো মনকে বিষাক্ত করে না, অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্যে প্রাপ্ত ক্রাইম ভাবনা ও ক্রাইম কর্মকে আমরা সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তা ও সাধারণ কর্মের মতোই স্বাভাবিক বলে মনে করি।এই বিভাগে আমি এইরকম ক্রাইম কাহিনীরই আলোচনা করছি পূর্ব ও পশ্চিম দুই দেশের, দুই বড় লেখকের গল্পের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। এ দুজন লেখক হলেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মার্কিন ও হেনরি।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধাতা ও বিধাতা রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর লেখনীতে ছোটগল্পের দমক একটানা নয়, বারবার অনুভব করেছিলেন। আমেরিকায় ও ইউরোপে যেমন এডগার অ্যালেন পো প্রমুখ ছোটগল্পের ধাতা-বিধাতারা তাঁদের গল্পের তোড়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ গল্পের সঙ্গে ক্রাইম কাহিনীর চুনোপুঁটির প্রবেশপথ মুক্ত রেখেছিলেন,তেমনি রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও দেখি যে ছোটগল্প লেখায় তাঁর প্রথম জোয়ারের তোড়ে সাধারণ মানুষের জীবনকথার ফাঁকে ফাঁকে ক্রাইম প্রসঙ্গের ও ঘটনার চাঁদকুড়ো-তেচোখা মাছও কিছু কিছু দৈবাৎ প্রবেশ করেছিল।

ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম বেগ অনুভব করেছিলেন ১৮৯০-৯১ সালে। তখন তিনি বাইশ তেইশ বছরের কলকাতাবাসের পর সবেমাত্র মধ্যবাংলার পল্লীজীবনের অন্তঃপুরে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতের সামনা-সামনি এসে তাঁর ভাবুক চিত্ত নতুন চেতনায় ও ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সেই চেতনা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর বাইশ বছরের কলকাতাবাসের চিত্তসঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে যায়। তাই তাঁর এই প্রথম তোড়ের গল্পগুলিতে সাহজাদপুরও আছে কলকাতাও আছে।

প্রথম তোড়ের গল্পগুলি বেরিয়েছিল ১২৯৮ সালের গোড়া থেকে ১৩০২ সালের শেষ পর্যন্ত (হিতবাদীতে ও 'সাধনায়')। এই গল্পগুলির মধ্যে যথাসম্ভব পরপর 'সাধনায়' বেরিয়েছিল এই কাহিনীগুলি, যার মধ্যে আমি ক্রাইম কাহিনী ও ঘটনার মৎস্যবীজ লক্ষ্য করেছি—সম্পত্তি-সমর্পণ, কঙ্কাল,মহামায়া, নিশীথে এবং দিদি। এই সময়ের লেখা খুব ছোট একটি গল্প বা 'নোট' ফসকে গিয়ে বেশ কিছুকাল পরে ১৩০৯ সালের 'বঙ্গদর্শন'-এ (নবপর্যায়) বার হয়েছিল 'সৎপাত্র' নামে। রবীন্দ্রনাথ তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। রচনায় সম্পাদকের নাম থাকত না তাই এ রচনাটিতেও তাঁর নাম ছিল না। তবে এই নিতান্ত ছোটগল্পটি গল্পগুচ্ছে স্থান পায়নি।

পাঠকেরা জানেন যৌবনকাল থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনেক ছোটগল্প লিখে এসেছেন। তবে গল্প লেখবার প্রেরণা তাঁর কখনো একটানা ছিল না, কবিতা বা গান লেখায়

যেমন। তাঁর চিত্তে গল্প লেখার ঢেউ মাঝে মাঝে ধাক্কা দিত। এই ধাক্কার প্রবল বান ডেকেছিল 'সাধনা' চালাবার সময়ে। সে বানের টান সরে যায় 'ভারতী' ও 'প্রদীপ' পত্রিকায় দু তিন বছর (১৩০৫-০৭) পর্যন্ত।

বান সরে গেলে দেখা গেল যে বিস্তীর্ণ রচনার পলিভূমিতে সাজানো রয়েছে মানব-ভূমিকার জু গার্ডেন ও মিউজিয়াম। বাঙালী জীবনের, মানব জীবনের বিচিত্র রূপ ও লীলা জীবন্ত হয়ে ফুটে রয়েছে তাতে। অপস্রিয়মাণ অতীত, সমাগত ও বর্তমান জীবনধারা পাশাপাশি বয়ে গেছে গল্পের স্রোতে। জীবনকে ব্যাপকভাবে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত যেন টানাজাল ফেলেছিল। তাতে রুই-কাতলা থেকে চিংড়ি ও শামুক-গুগলি সবই উঠে এসেছে অর্থাৎ মানব-জীবনের বিচিত্র রূপখণ্ড সবই। তাই তাঁর এই গল্পগুলির মধ্যে মানবজীবন-রসের সব স্বাদের নমুনাই মেলে। রবীন্দ্রনাথ কোমর বেঁধে ক্রাইম, ম্যাকাবর ও সুপারন্যাচারাল স্টোরি লিখতে বসেননি। কিন্তু এই সব রসের গল্প আপনিই এসে গেছে তাঁর কলমের মুখে। পাঠককে মনে রাখতে বলি যে, রবীন্দ্রনাথের এই সব গল্পে যদি ক্রাইম-ম্যাকাবর-সুপারন্যাচারাল গল্পরীতির খোঁজ করেন তবে হয়তো কিছু হতাশ হতে পারেন কিন্তু তিনি যদি এই সব গল্পের সম্পূর্ণ রস চান তবে তা আশাতীতভাবে পেতে পারেন। আজ পর্যন্ত এই সব ভাবের গল্পরচনায় কোনো বাঙালী লেখক রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পারেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথের এই সব গল্প স্বীকৃত সাহিত্যশিল্প অনুযায়ী গড়া হয়নি। মানবজীবন-লতা তাঁর শিল্পের মাচাতে আপনিই লতিয়ে উঠেছে। এখন এই গল্পগুলির আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মিষ্টি গল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ' বেরিয়েছিল 'সাধনায়' ১২৯৮ সালের পৌষ মাসে। গল্পটির আধার আমাদের দেশে একদা প্রচলিত 'যখ' দেবার পৈশাচিক প্রথা। ম্যাকাবর ধরনের গল্প হিসেবেও এটির জুড়ি মেলা শক্ত।

এই অত্যন্ত 'বীভৎস' গল্পটির কাহিনী জমাট হয়েছে নায়ক যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর অভাবনীয় কৃপণতায়। তার মনে সামান্য একবিন্দু সরসতা ছিল, সে তার নাতির প্রতি মনের অবচেতন টান। কিন্তু এমনি তার অদৃষ্টের নিদারুণ চক্রান্ত যে সে তার উদ্দিষ্ট ধনাধিকারীকেই 'যখ' দিয়েছিল।

গল্পটি অত্যন্ত ম্যাকাবর হলেও সেকালের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক নয়। এখনকার দৃষ্টিতে গল্পটিতে ক্রাইম আছে—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নেই।

দ্বিতীয় গল্প 'কঙ্কাল', 'সম্পত্তি সমর্পণের' দুমাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা'য় ১২৯৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। মোটামুটি গল্পটি প্রেমের—আত্মরতি প্রেমের। নায়িকা অপূর্ব সুন্দরী। সে নিজেকে নিয়েই বিভোর। বিয়ে হল। স্বামীকে দুচক্ষে দেখতে পারলে না। হুড়কো বনে গেল। খুব অল্পকাল মধ্যেই সে বিধবা হল। 'বিষকন্যা' বলে শ্বশুরবাড়িতে তার ঠাঁই হল না। সে বাপের বাড়ি চলে এল দাদার কাছে। নিজেকে নিয়েই তার দিন কাটতে লাগল, তারপর আবির্ভূত হল দাদার বন্ধু শশিশেখর। মেয়েটির সৌন্দর্যে শশিশেখর অভিভূত হয়ে পড়ল। তাতে মেয়েটির আত্মরতি আরও বাড়ল। শশিশেখরের মানসিকতাও তাকে কথঞ্চিৎ প্রেমের তৃপ্তি দিয়েছিল। বিধবার সঙ্গে বিবাহ অসম্ভব বুঝে শশিশেখর সাংসারিক প্রয়োজনে অন্যত্র বিবাহ করতে প্রস্তুত হল। বিয়ে করতে যাবার আগে শশিশেখর মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে এল। শশিশেখর তার বন্ধু অর্থাৎ মেয়েটির দাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে মদ খেত। মেয়েটি তা জানত। সেই মদে বিষ দিয়ে খাওয়াল সে শশিশেখরকে। তারপর নিজে সে নববধূর মতো বেশ করে বাগানে গিয়ে আত্মহত্যা

করলে। (কীভাবে তা বলা নেই, হয়তো মদ খেয়েই)। ডবল ক্রাইম দ্বারা (খুন এবং আত্মহত্যা) মেয়েটির বিষকন্যাত্ব শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়ে গেল। গল্পটি খুব ভালো ক্রাইম স্টোরি, প্রেমের গল্পের রঙে সমুজ্জ্বল, ভূতের গল্পের স্বচ্ছ আবরণে মণ্ডিত। এটি যে ভূতের গল্প নয় তা অন্যত্র দেখিয়েছি ("রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু", পৃঃ ৮০-৮১)।

গল্পটি যে ক্রাইম কাহিনী তা অস্বীকার করবার কোনো পথ নেই, যেহেতু কাহিনীর পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক ও হিংসাত্মক। অনেক দিন পরে লেখা 'দৃষ্টিদান' গল্পটি 'কঙ্কালে'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে কাহিনীর ক্রাইমত্ব পাঠক স্পষ্ট করে বুঝতে পারবেন।

'কঙ্কালে'র আগে পিছে দুটি গল্পই ম্যাকাবর। 'সম্পত্তি সমর্পণে'র কথা আগে বলেছি। এইবার 'মহামায়া'র কথা বলছি। লোকাচার মাফিক ক্রাইম গল্প না হলেও কাহিনী দুটিতে ক্রাইমের মশলা বেশ আছে। প্রথমটিতে ক্রাইম হল যখ দেওয়া—জীবন্ত মানুষকে পুঁতে ফেলা। দ্বিতীয় গল্পে ক্রাইম হল সহমরণে জীবন্ত দগ্ধ করার। প্রথম গল্পে আছে অন্তর্বাহী স্নেহরস অতি ক্ষীণ ধারায়, দ্বিতীয় গল্পে আছে অন্তর্বাহী প্রেমরস, পুষ্ট কিন্তু তির্যকধারায়। 'মহামায়া' গল্পের বীভৎসতা মহামায়ার দাদা ভবানীচরণের আচরণে। মৃতকল্প শ্মশানস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে ভগিনী মহামায়ার বিবাহ দেওয়া এবং তার পরই ভগিনীকে সহমরণে চড়ানো। কিন্তু এতেই শেষ নয়। শেষে যে আকস্মিক নিষ্ঠুরতার বজ্রপাত আছে, তা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি মর্মান্তিক। তা হল নিদ্রিত মহামায়ার ঘোমটা অপসারণ। এই সামান্য ঘটনাটুকু মহামায়াকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের মিস্ট্রি গল্পের মধ্যে সবচেয়ে জটিল হল 'নিশিথে'। গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিল 'সাধনা'য় মাঘ ১৩০১ (১৮৯৪) সালে। বরানগরবাসী তরুণ জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তি, উপস্থিত পত্নী ভক্ত। তাঁর বুদ্ধিমতী পত্নী কিন্তু তাঁর প্রেমের উচ্ছ্বাসকে একেবারেই আমল দিতেন না। ঝরঝরে তরল হাসিতে স্বামীকে অপ্রতিভ করে দেন। এমন সময় দক্ষিণাবাবুর কঠিন পীড়া হল। পত্নী প্রাণপণ শুশ্রূষা করে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললেন বটে কিন্তু নিজে পড়লেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। প্রেমাবদ্ধ কৃতজ্ঞ দক্ষিণাবাবু পত্নীর আরোগ্যের জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে পত্নীকে নিয়ে এলাহাবাদে বায়ু পরিবর্তনে গেলেন। সেখানে হারাণ ডাক্তার চিকিৎসা করতে লাগল। ক্রমশ দক্ষিণাবাবুর অবোধ চিত্তে পত্নী-শুশ্রূষায় ক্লান্তি দেখা দিলে। তিনি এই ক্লান্তির কিঞ্চিৎ অপনোদন করতে লাগলেন ডাক্তারের অবিবাহিতা কন্যা মনোরমার সঙ্গে আলাপ করে। ডাক্তার এই সুযোগে মেয়েটিকে গছাতে চাইলে দক্ষিণাবাবুর হাতে।

একদিন সুন্দরী মনোরমা রুগ্না মহিলাকে দেখতে এল। রোগিনী তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। স্বামীর সঙ্গে সুন্দরী মেয়েটিকে তাই হঠাৎ দেখে চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে স্বামীকে প্রশ্ন করেছিল, 'ও কে ও কে ও কে গো ?' এই কথাটি দক্ষিণাবাবুর অবচেতন মনে বসে গিয়েছিল।

তারপর সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। হারাণ ডাক্তার চাইলে দক্ষিণাবাবুর পত্নীর দ্রুত মৃত্যু ; মহিলা নিজেও তাই কামনা করলেন এখন। স্বামীকে স্বস্তি দেবার জন্যে হারাণবাবুর চালাকি বুঝে নিয়ে রুগ্না মহিলা বিষ ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। এ ঘটনার তাৎপর্য দক্ষিণাবাবুর অবচেতন মন এড়িয়ে যায়নি।

যথাকালে মনোরমাকে বিয়ে করলেন দক্ষিণাবাবু। কিছুদিন বেশ কাটল। তারপর অবচেতন মনের সুপ্তি ভেঙে গেল। পূর্বপত্নী-প্রিয় কৃতজ্ঞ দক্ষিণাবাবুর অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব শুরু হল, প্রসুপ্ত কৃতজ্ঞতার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। মন ঠাণ্ডা করতে তাঁকে মদ ধরতে হল।

গল্পের ম্যাকাবর ও সুপারন্যাচারাল রস জমাট বাঁধল।

বাঙালী সংসার একান্নবর্তী তাই তার পরিধি ছিল কিছু বৃহৎ। সে কারণে বাঙালীর সমাজেরও পরিধি নিতান্ত অপ্রশস্ত ছিল না। এমন সংসারে ও সমাজে মানুষের ক্রাইম প্রবৃত্তি জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। বাঙালীর ভদ্রসমাজে পারিবারিক আওতায় যে ক্রাইম প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যেত তা চুরি-চামারি বাদে প্রধানত নবাগত বধূকে নিয়েই ঘটত। নববধূ গৃহিণীর মনোমত না হলে তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হত। এই ছিল বাঙালী সংসারে সবচেয়ে পরিচিত ক্রাইম। এ ক্রাইমের নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক পরিচয়ের ইঙ্গিত পাই রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত এই মেয়েলী ছড়াটিতে—

হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

শ্বশুরবাড়িতে নিপীড়িত বালিকাবধূ আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োবারও সুযোগ পাচ্ছে না। তাই সে কাতর হয়ে ডাকছে নদীকে। নদী যদি দয়া করে বান ডেকে ঘরের কাছ অবধি আসতে পারে, তাহলে সে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়োয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্পে নির্যাতিত বধূর ছবি আছে। কিন্তু সে ছবিতে ক্রাইমের ছোপ নেই।

বাঙালীর সংসারে বিবাহসূত্রে আরও এক ধরনের ক্রাইম সম্ভাবনা কখনো কখনো জাগত। এ হল শ্যালকের সম্পত্তির উপর জামাতার লোভ। এই রকম একটি ক্রাইম কাহিনীর আদল পাই রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পে (চৈত্র ১৩০১)। গল্পটির প্রধান রস হচ্ছে ভ্রাতৃস্নেহ ও কারুণ্য। সে রস প্রবল হয়েও কিন্তু কাহিনীর মৌলিক ক্রাইমত্ব ঢাকা দিতে পারেনি। স্বামী জয়গোপালের প্রচণ্ড লোভের গ্রাস থেকে নাবালক ভাই নীলমণিকে বাঁচাবার জন্যে শশিকলা ভাইকে তার প্রবল আর্তি সত্ত্বেও তার অভিভাবকত্ব ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নিজের তরফে নয়, ভাইয়ের তরফে। তবে সে নিজেও অচিরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল তার স্বামীর প্রতিহিংসার বলি হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম জোয়ারে ভেসে-আসা ক্রাইম কাহিনী কেমন সহজে তার বিশেষ রঙটি হারিয়ে সাধারণ জীবনের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে এসেছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'কঙ্কাল' (১২৯৮) গল্পের সঙ্গে 'দৃষ্টিদান' (ভারতী, পৌষ ১৩০৫) গল্পটি মিলিয়ে পড়লে। গল্প দুটির বিষয় মোটামুটি এক, নিজের শারীরিক অক্ষমতার দরুণ প্রেমিকের বা স্বামীর প্রেমে ঘাটতি আশঙ্কা বা অনুভব। দুটি কাহিনীর মধ্যে অন্তরঙ্গ মিল থাকলেও গল্প দুটিতে নায়িকার মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক। 'কঙ্কালে'র নায়িকা নায়ককে বিবাহ করতে পারে না তাই সে তাকে আর কাকেও বিবাহ করতে দেবে না। নিজের স্বার্থ সফল করবার জন্যে খুন ও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। 'দৃষ্টিদানে'র নায়িকা কুমুদিনী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যাকুল হয়েছিল নিজের কথা ভেবে নয়, স্বামীর কথা ভেবে। আত্মগ্লানির অতিশয্যে অবিনাশ কুমুদিনীর সামনে গৃহদেবতার নাম নিয়ে গুরুতর শপথ করেছিল যে সে আর দ্বিতীয় বিবাহ করবে না।

পরে যখন অবিনাশ তার পিসির ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতে গেল কুমুদিনীকে না জানতে দিয়ে, তখন কুমুদিনী ঠাকুর ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দেবতার পায়ে আত্মনিবেদন করে বলতে লাগল, 'হে ঠাকুর, আমাকে বিধবা করো, হে ঠাকুর, আমাকে বিধবা করো।'

কুমুদিনীর এই যে দারুণ দৃঢ় নিশ্চয় তা খুন ও আত্মহত্যার চেয়েও কঠিন। এ হল স্বামী হত্যা। কিন্তু এতে তো কিছুতেই ক্রাইমের রঙ ফোটে না। ক্রাইম ভাবনার এ যেন উল্টো দিক।

'নিশীথে' গল্পটি 'কঙ্কাল' ও 'দৃষ্টিদান' গল্প দুটির যেন গাঁটছড়া। এই লিঙ্কটি অনুধাবন করবার বরাত দিলুম পাঠকের উপর।

'নিশীথে'র আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দুটি সুপারন্যাচারাল অর্থাৎ ভৌতিক গল্প।

'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রথম বেরোয় 'সাধনায়' ১৩০২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। গল্পটি পাশ্চাত্য সাহিত্যদৃষ্টিতেও নিটোল ভৌতিক গল্প। এ গল্পের আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৮, পৃ ৩৩৬ ; 'রবীন্দ্রনাথের গল্পশিল্প' প্রবন্ধ, রাতের তারা দিনের রবি, বৈশাখ ১৩৯৫)।

দ্বিতীয় গল্প 'মণিহারা' প্রথম বেরিয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ সালের (১৮৯৮) অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, 'দৃষ্টিদানে'র আগের মাসে। সে বছর রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদক। 'ক্ষুধিত পাষাণ' যেমন বিলিতি আদর্শের নিটোল ভৌতিক গল্প, 'মণিহারা' তেমনি দেশীয় আদর্শের নিটোল ভূতের কাহিনী। 'ক্ষুধিত পাষাণ' আরব্য উপন্যাস স্টাইলের পরিপূর্ণ রোমান্টিক ভাবনা-ভাবিত। 'মণিহারা' আত্মঅনুভব আশ্রিত পত্নীপ্রেমের গল্প। প্রথম গল্পে বহু নারীর অতৃপ্ত প্রেম ও ভোগস্পৃহা প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে জমাট হয়ে যেন ভাবমূর্তি পেয়ে নায়ককে অভিভূত করতে চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় গল্পে সন্তানহীন পত্নী-ভক্ত স্বামীর প্রতি উদাসীন গহনা-আসক্ত সাধারণ মনোভাবযুক্ত নারীর অপুষ্ট, অতৃপ্ত বাসনার প্রকাশ। গল্পটির সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৮, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬।) 'ক্ষুধিত পাষাণ' সাহিত্যিক ভূতের গল্প। 'মণিহারা' মজলিসি ভূতের গল্প।

এই আলোচনার শেষ গল্প 'ডিটেকটিভ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'তে 'দৃষ্টিদান'-এর আগে ১৩০৫ সালের আষাঢ় সংখ্যায়।

গল্পটি সমসাময়িক বাংলা ডিটেকটিভ কাহিনীর প্যারডি। রবীন্দ্রনাথ যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দেব, মণীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, পাঁচকড়ি দে ইত্যাদির রচনা পড়েছিলেন তারই প্রতিক্রিয়ার ফল এই গল্প। বেশি না বলে গল্পটির প্রথম কয়ছত্র উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

> আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম। ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি। তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমন কি তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনো প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপন কার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা

জন্মিয়াছিল কোনো অতি ক্ষুদ্র ঘটি বাটি চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

গল্পের নায়ক নিজেই পুলিশের লোক, ডিটেকটিভগিরি করেন। প্রতিনায়ক অর্থাৎ 'কালপ্রিট' যে সেও প্রকারান্তরে নজর রেখে চলেছে নায়কের উপর। গল্পটিতে পুলিশি গোয়েন্দা চালের ব্যাপার কিছু কিছু প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজী ডিটেকটিভ বই যে রবীন্দ্রনাথের অপঠিত ছিল না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে এই 'ডিটেকটিভ' গল্পটিতে। (একটি অবান্তর প্রমাণও এই প্রসঙ্গে দাখিল করে দিই। পাঁচকড়ি দে-র 'জীবন্মৃত রহস্য', যে নাম 'সেলিনাসুন্দরী'তে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা উপহার দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে।) ডিটেকটিভ কাহিনী না লিখেও এবং উপরে আলোচিত দুখানি গল্পকে উপেক্ষা করলেও শুধু এই 'ডিটেকটিভ' প্যারডি গল্পটির জন্যেই রবীন্দ্রনাথের নাম বাংলা 'ডিটেকটিভ সাহিত্য' থেকে বাদ যাবে না।

এইবার 'সৎপাত্র' গল্পটির কথা বলি। এ গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর নেই এবং গল্পটিও গল্পগুচ্ছে সংকলিত হয়নি। অথচ গল্পটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তা অনেককাল আগে আমি প্রতিপন্ন করেছিলুম। (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস,তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃঃ ৩৪২ দ্রষ্টব্য)।[১]

গল্পটি আকারে নিতান্তই ছোট, প্রকারে পুরোপুরি 'ক্রাইম স্টোরি'। তবে পুলিশি কাণ্ড পর্যন্ত গড়ায়নি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। রচনার স্টাইল তীক্ষ্ণ ও ব্যাঙ্গাত্মক। লেখাটি যে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে বুদ্ধিমান ও সহৃদয় পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকে না।

স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালীর সংসারে ও সমাজে প্রধান ক্রাইম ছিল অন্তঃপুরঘটিত। এমন ক্রাইমে সাধারণ বলি ছিল নব-বিবাহিত বধূ। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পে এই ক্রাইমের ইঙ্গিত আছে। এ কথা আগে বলেছি। এমন ক্রাইম ঘটনা প্রায় পুরোপুরিভাবে বিবৃত হয়েছে 'সৎপাত্র' গল্পটিতে। গল্পটি সংক্ষেপে বলছি।

বাইরে মৃদুবাক্ ভালো মানুষ সাধুচরণের প্রকৃতি সন্দেহপ্রবণ, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। সন্দেহজনিত নিষ্ঠুরতায় তার দুটি পত্নী সন্দেহজনকভাবে দেহত্যাগ করেছে। সাধুচরণের তৃতীয় পত্নী বিমলাও কীভাবে সপত্নীদের পথ অনুসরণ করেছে এবং কীভাবে আর এক নীতিজ্ঞানহীন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্যে সাধুচরণ পুলিশের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে তাই এই গল্পে বলা হয়েছে।

> ভোলানাথের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তিনি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা। পুলিশের ঘুষ এবং অন্যায় অত্যাচারের সম্বন্ধে তিনি অনেক লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন। রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার দ্বারে ঘা পড়িল। সাধুচরণের চাদর হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার বাক্সর মধ্যে কিছু টাকা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।
>
> পরদিন রাষ্ট্র হইল, সাধুচরণের যুবতী স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। বিমলার পিতা অবিশ্বাস প্রকাশপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়া দোহাই দিয়া পড়িলেন। কিন্তু এবারেও এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোককে রক্ষা করিল। ভোলানাথ পরোপকারী। সে নিজের জন্যেও উপায় করিতে জানে।

---

১. আমার লেখা পড়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলেছিলেন গল্পটি আসলে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলাদেবীর লেখা। রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করেছিলেন মাত্র। এ কথা যথার্থ হতে পারে না। গল্পটি যখন বেরিয়েছিল তখন বেলাদেবীর বয়স পনেরো-ষোলো। সে বয়সে এমন গল্পভাবনা অসম্ভব।

অনতিবিলম্বে অনেকগুলি বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল।

কন্যাবৎসল পিতারা সৎ কুলীনের মর্যাদা বোঝে। স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের যত্র আয় তত্র ব্যয়।

ডিটেকশন বর্জিত ক্রাইম স্টোরির নমুনারূপে ধরলে গল্পিকাটি অনবদ্য। বলা বাহুল্য, 'সৎপাত্র' গল্পিকাটি 'দিদি' গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

দক্ষিণ খণ্ড

অনুসরণ

ফাঁড়িদারোগা

ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের পরেই বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা শুরু হয়েছিল। ডিটেকটিভ কাহিনীর যথার্থ উৎপত্তি হয়েছিল পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তনের পরেই। এ ব্যবস্থা ফরাসী দেশে প্রথম চালু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের সময়। তারপর ব্রিটেনে ও ভারতে পুলিশী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। সুতরাং পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে লেখা কোনো গোয়েন্দা-কাহিনী জাতীয় রচনাকে আধুনিক অর্থে ডিটেকটিভ কাহিনী বলতে পারি না। সেইজন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার তাবৎ গোয়েন্দা কাহিনীই পূর্ব খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

পূর্ব খণ্ডে যে বাংলা গল্পের আলোচনা করেছি তা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের লেখনী অনুসরণ করে আসে নি। সেগুলি এসেছে লোকসাহিত্যের মৌখিক প্রবাহ স্রোতে। সেগুলির মধ্যে দু'একটি কাহিনী দৈবাৎ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুঁথিবদ্ধ হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের পুরানো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যেও গোয়েন্দা কাহিনীর আভাস একেবারে অনুপস্থিত নয়। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে সেই আভাসের মধ্যেও যেন আধুনিক গোয়েন্দার উঁকিঝুঁকির চকিত দর্শন পেয়েছি।

পুরানো বাংলা সাহিত্যে ও পূর্বাপর লোক-সাহিত্যে ক্রাইম কাহিনীর উঁকিঝুঁকির পূর্ব খণ্ডে কিছু উল্লিখিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত বিশিষ্ট ধারাগুলি প্রায় সবই বাঙালী লেখকের দ্বারা সর্বপ্রথম ইংরেজীতে উপস্থাপিত হয়েছিল, তারপরে বাংলায়। আমরা জানি যে কবিতায় রঙ্গলাল ও মধুসূদনের আগে এসেছিলেন কাশীপ্রাদ ঘোষ ও শশীচন্দ্র দত্ত। এঁরা ইংরেজীতে কবিতা লিখেছিলেন। নাটকে তারাচরণ শিকদার ও রামনারায়ণ তর্করত্নের আগে এসেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ইংরেজীতে নাটক লিখেছিলেন। গল্পে-উপন্যাসে প্যারীচরণ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে শশীচন্দ্র দত্ত ইংরেজীতে উপন্যাস লিখেছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ কাহিনীর আমদানি হয়েছে ইংরেজী থেকে। সকলে অবগত আছেন কিনা জানি না এদেশে পুলিশের ব্যবস্থা প্রথম হয় বিলেতে লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তবে এ পুলিশ শুধু কলকাতার জন্যেই ছিল না, সম্পূর্ণ দেশের অর্থাৎ তখন দেশের যতটা ইংরেজ অধিকার ছিল ততটার জন্যে। সে হল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা।

সেকালে ঠগীর ও ডাকাতের অত্যাচার খুব বেড়ে যাওয়ায় এদের দমনের জন্যে কর্নেল শ্লীম্যান কমিশনার নিযুক্ত হলেন। তিনি কয়েকজন দারোগা নিয়োগ করেছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন এক ভদ্রবংশীয় চতুর বাঙালী যুবক। নাম বরকতউল্লা। দারোগাগিরি বাদে

এঁর অসামান্য চাতুর্য ও ধূর্ততার জন্য লোকের মুখে নামটি দাঁড়ায় 'বকাউল্লা'। পরে এঁর নাম 'বাঁকাউল্লা'য় পরিণত হয়েছিল। বরকতউল্লার দক্ষতার কতকগুলি কাহিনী ঠগী কমিশনারের ফাইল থেকে উদ্ধার করে ছাপা হয়েছিল ইংরেজীতে। কবে এবং কে তা করেছিলেন জানা নেই। অনুমান করি ১৮৫৫ সালের আগে নয়। যিনি সংকলন করেছিলেন তাঁর মনে আদর্শ হয়তো ছিল ফরাসী ভিদকের মেমোয়ার্স। অনেককাল পরে বইটি বাংলায় রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হয়েছিল 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে। এ অনুবাদের একাধিক সংস্করণও ছাপা হয়েছিল। সম্প্রতি আমি এ বইটি সম্পাদন করেছি। (এ. কে. পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৩৮৯।)

'বাঁকাউল্লার দপ্তরে' বরকতউল্লার কিছু আত্মপরিচয় আছে। তার থেকে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করছি।

> 'লর্ড হেস্টিংস হইতে হার্ডিঞ্জ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী ভার গ্রহণ হইতে বাঙ্গালা দেশে শান্তি-সংস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সে সময়ের দেশের অবস্থা আধুনিক সুশাসিত প্রজা-লোকেরা ধারণায় আনিতেও পারেন না।
>
> আমার নিজের জীবনে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সমকর্মচারীদের মুখে যে সকল অনুসন্ধানবৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তাহা অতি অদ্ভুত। অবসরকালে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি পথ খরচ করিয়া আমার দরিদ্র কুটিরে পদার্পণ করেন ; গল্প শুনিয়া স্তম্ভিত হন। অন্যের কি কথা, অধুনা যে সকল কর্মচারী গোয়েন্দা-পুলিশে কার্য করিতেছেন সে সকল উপাখ্যান তাঁহাদিগের পক্ষেও শিখিবার জিনিস। বেণ্টিক বাহাদুরের আমলেই বাড়াবাড়ির সূত্রপাত।'

বরকতউল্লার আত্মকাহিনী পড়লে বোঝা যায় তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন। তিনি দেশ থেকে বেশ খানিকটা ফার্সী শিখে এসে কলকাতার মাদ্রাসায় ভর্তি হন। অনুমান করি তাঁর দেশ ছিল হুগলী জেলার বালিয়া পরগণায়। বরকতউল্লার সম্বন্ধে আরো কিছু সংবাদ পেয়েছি। তা মিলেছে মহম্মদ মিরণের 'বাহারদানেস' বইটিতে (১২৪৪ সাল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৫৪ সাল)। বরকতউল্লা মহম্মদ মিরণের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিরণের উক্তি 'বাঁকাউল্লার দপ্তরে'র মদীয় সংস্করণে দ্রষ্টব্য।

বাঁকাউল্লার দপ্তরে ১২টি আখ্যায়িকা আছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'মামুদ হাতী'। পাঠকদের কাহিনীটি পড়তে বলি।

বাংলা দেশে পুলিশি দক্ষতার কথা বলতে গেলে বাঁকাউল্লার দপ্তরের পর আরো দুটি বইয়ের নাম করতে হয়। একটি বাংলায় লেখা, অন্যটি ইংরেজীতে। বাংলা বইটির নাম 'সেকালের দারোগার কাহিনী'। লেখকের নাম গিরিশচন্দ্র বসু। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' পত্রিকায় (১৮৯৩-৯৪)। ঢাকা থেকে পুস্তকাকারে বেরোয় ১৮৯৫ সালে, সম্প্রতি শ্রীঅলোক রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও পুর্নমুদ্রিত। ১৮৫৩ সালে গিরিশচন্দ্র পুলিশের দারোগা নিযুক্ত হন। ১৮৬০ পর্যন্ত এই কাজে তিনি বহাল ছিলেন। তারপর মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে চাকুরি পেয়েছিলেন। এই কাজে শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

বইটিতে গিরিশচন্দ্র বসুর পুলিশী কেরামতির কোনো পরিচয় না থাকলেও দুষ্কৃতকারীদের

খাঁটি পরিচয় মেলে। একটি বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান। তা হল মনোহর ঘোষের কাহিনী। মনোহর ঘোষকে নিয়ে গিরিশচন্দ্র স্বচ্ছন্দে একটি উপন্যাস লিখতে পারতেন যা পরবর্তীকালের 'বিশ্বনাথ' বা 'রঘু-ডাকাতে'র সমকক্ষ হতে পারত। গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে ডাকাতি ও রাহাজানির যে চিত্র আছে তা সম্পূর্ণ খাঁটি।

ইংরেজী বইখানির লেখক হলেন মেজর এ. টি. এম্. র‍্যাম্‌জে। বইটির নাম 'এ ডিটেকটিভস্ ফুটস্টেপস, বেঙ্গল'। ছাপা হয়েছিল ১৮৮২ সালে লণ্ডনে। প্রকাশক আর্মি এণ্ড নেভি সোসাইটি কোম্পানী লিমিটেড। লেখক এদেশে এসেছিলেন এক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসাররূপে ১৮৫৩ সালে। সম্ভবত সিপাহি বিদ্রোহ দমনে সার্থকতার পরে তিনি পুলিশের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কাজে একটানা উনিশ বছর লিপ্ত থাকবার পর তিনি বইখানি লিখেছিলেন।

মেজর র‍্যাম্‌জে পুলিশ বিভাগে এক মফঃস্বলের পুলিশ দলকে—চৌকিদার ও ফাঁড়িদারদের—গোয়েন্দার কাজে তালিম দেবার প্রযত্ন করেছিলেন। তাঁর কাজের ফলাফল নবীন পুলিশ কর্মচারীদের অবগত করাবার জন্যেই বইটি লেখা হয়েছিল।

বইটিতে র‍্যাম্‌জের অভিজ্ঞতার কথা কিছু কিছু আছে। কোনো কোনো বিবরণ বেশ অভিনব। যে বিবরণটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি তা যখন ঘটেছিল, তখন র‍্যাম্‌জে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই অখণ্ড প্রদেশের এক পশ্চিম সীমান্ত জেলায় (সম্ভবত পাটনায়) পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

আখ্যানটির নাম 'কালোয়াৎ চোর'। লেখকের বর্ণনা অনুবাদ করে দিচ্ছি। বাঁকাউল্লার দপ্তরের কথা ছেড়ে দিলেও বাংলা সাহিত্যে যে পুলিশী কাহিনী নিয়ে গোয়েন্দা গল্প রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তারবার্তার সাহায্যে পলাতক ব্যক্তিকে যে ধরা যায়, তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

> একদিন আমি সকালের টহল থেকে একটু দেরি করে ফিরে শুনি যে, অমুকবাবু জরুরি দরকারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
>
> এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে এবং ভদ্রলোকের যোগ্যতা এবং চরিত্র সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমি জানতুম যে খুব জরুরি দরকার না হলে অমুকবাবু এই সাতসকালে আমার বাড়ি আসতেন না। আমি তাড়াতাড়ি আমার অতিথির কাছে হাজির হলুম এবং তিনি বললেন যে আজ ভোরে তাঁর বাড়ি থেকে হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্তর চুরি হয়ে গেছে। ঘটনাটি এরকম। কয়েক সপ্তাহ আগে ২০/২১ বছরের এক বাঙালী যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানায় যে সে চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে এবং বাবুর কাছে দু'চারদিন আশ্রয় চায়। আগন্তুককে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বাবু থাকতে দেন। কিন্তু এদিকে কোনো সুবিধে না হওয়ায় সে আরও পশ্চিমে চাকরির চেষ্টা করতে গেল। বাবুর কাছে থাকবার সময় বাবুর যে একটি রূপোর বাঁশি ছিল, সেটি সে বাজাত। তার বাঁশির সুর শুনে বাড়ির লোকজন খুব খুশি হয়েছিল।
>
> তার ব্যবহার এবং বাজনায় পটুতা দেখে বাবু তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই করেননি এবং সে চলে যাওয়ায় বাবু খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।
>
> কয়েক সপ্তাহ বাদে সে চাকরি-বাকরি না পেয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে অমুকবাবুর কাছে ফিরে এসে আবার আতিথ্য গ্রহণ করলে।

এক সপ্তাহ কি দশদিন বাদে এই অতিথিবৎসল বাবু একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে তাঁর অতিথি কিছু না বলে চলে গেছে।

তাঁর সেই রূপোর বাঁশি, কিছু ভাল কাপড় জামা, আর প্রায় শ' পাঁচেক টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটি আগে জানতে না পারায় আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। বাবু বললেন যে ছটা থেকে সাতটার সময় তিনি এসে দেখেন যে আমি বেরিয়ে গেছি। আমি কোথায় গেছি বা কখন ফিরব এ ব্যাপারে আমার চাকররা তাঁকে কিছুই বলতে পারেনি। এর মধ্যে তিনি যতটা সম্ভব এই পলাতককে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং পুলিশও খোঁজাখুঁজি করছে। স্টেশন থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সেই পলাতক যুবকের মতো দেখতে একটি লোককে ভোরবেলায় প্রায় চারটে নাগাদ স্টেশনে দেখা গেছে।

এইটুকু জানার পর আমি বাবুকে সেই চোরের চেহারা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। বাবুর কাছ থেকে যা সন্ধান পেলুম তাতে বিশেষত্ব কিছু পাওয়া গেল না। এবং এইটুকু সংবাদ থেকে কাউকে ধরাটাও ঠিক হবে না। আমি সেইজন্যে বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম যে তিনি তাঁর অতিথিকে খালি গায়ে চান করতে দেখেছেন কিনা।

তিনি বললেন যে হ্যাঁ, তিনি দেখেছেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম যে তিনি তার শরীরে কোনও বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন কিনা।

তিনি বললেন যে তার বাঁদিকের কণ্ঠায় হাড়ের কাছে একটা হাল্কা দাগ আছে। আমি বাঁশির সাইজ্ ও রকম এবং কাপড়চোপড় সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলুম।

আমি এরপর মোগলসরাই রেল পুলিশকে চোরের বর্ণনা দিয়ে একটা 'তার' করে দিলুম। আমি দেখলুম যে 'তার' করতে প্রায় দশ টাকা খরচ হবে। আমার কাছে বা বাবুর কাছে তখন অত টাকা ছিল না। আমি তাঁকে বললুম যে 'তার' করাটা খুব জরুরি দরকার। তাঁকে আরও অনুরোধ করলুম যে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে এখুনি যেন টেলিগ্রাফটা তিনি করে দেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের এইসব কথাবার্তা হয়ে গেল। রেলের টাইম টেবিলে দেখলুম যে, চোর যে ট্রেনে যাচ্ছে সেটা সাতচল্লিশ মিনিটের মধ্যে মোগলসরাই পৌঁছবে। মোগলসরাই থেকে বেনারস যাবার একটা লাইন আছে। এইজন্যে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা যাচ্ছিল না। এরপরে আমি পুলিশের একজন অফিসারকে ত্রিশ মাইল দূরে একটি 'তার' পাঠালুম যেখানে খুব সম্ভবত চোরটি নেমে যেতে পারে।

আমার এই ব্যবস্থার ফল ফলল। আমার 'তার' মোগলসরাই পুলিশের কাছে সময়মতো পৌঁছে গেল। একজন পুলিশের লোক ট্রেন ছাড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ট্রেনে উঠল এবং ট্রেনটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরোবার পথের সামনে নেমে দাঁড়ালো। ঠিক সময় একটি যুবক সেই রকম বাঁশি হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নামলো। সে যে কোটটি পরেছিল সেটা চুরি করা। তার বাঁদিকের কণ্ঠার হাড়ে একটি দাগও পাওয়া গেল।

দুদিন বাদে চোরটিকে চোরাই মাল সমেত আমার কাছে নিয়ে আসা হল।

রেল পুলিশ তারবার্তার বিবরণের খুব প্রশংসা করলেন। কারণ ওই তারবার্তার ভিত্তিতেই চোরকে অত সহজে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

কয়েকদিন বাদে কালোয়াৎ চোরটিকে দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

এই ঘটনার শেষে অমুক বাবু পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিলেন পুলিশকে, যারা চোর ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমি সেই টাকা পুলিশের বড়োকর্তাকে পৌঁছে দিলুম। তিনি সেই টাকা স্থানীয় পুলিশদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

গল্পটি একটি ভাল পুলিশ এনকোয়ারি কাহিনী।

উপরের আলোচিত বইটির মতো আরেকটি বইয়ের অনুবাদ দেখেছি। মূল বইটির নাম Every Man His Own Detective, লেখক R. Reid (প্রকাশকাল ১৮৮৭)। অনুবাদ করেছিলেন পরিমল গোস্বামী। অনুবাদ-বইটির নাম 'ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা' (প্রকাশকাল ১৯৬৬)। লেখক ছিলেন কলকাতা পুলিশের একজন ঝানু ডিটেকটিভ। কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন কলকাতায় এসেছিলেন (১৮৭৫-৭৬) তখন লেখক রীড তাঁর রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বইটি অধস্তন পুলিশ কর্মচারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখা। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার নথিপত্র থেকে অনেকগুলি কাহিনী বিবৃত করেছেন। এ কাহিনীগুলিতে তখনকার কলকাতার বিশিষ্ট ও বিচিত্র ক্রাইম ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ পাই। তবে কাহিনীগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও সাহিত্যের দিক দিয়ে তেমন মূল্যবান নয়। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এ গল্পগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গল্পগুলি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা দপ্তর সিরিজের প্ররোচনা (হয়তো রসদত্ত) দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

থানাপুলিশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-শৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম রচনাটি ক্রাইম কাহিনী। তবে লেখা ইংরেজীতে, নাম 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'। প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকায় (১৮৬৪), পুস্তকাকারে নয়। এই দুটি কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস এই ক্রাইম-কাহিনীটি সমসাময়িক পাঠকসাধারণের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল, সমসাময়িক সাহিত্যামোদীদের প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ক্রাইম কাহিনীর উপর ঝোঁক এড়াতে পারেননি। অতঃপর তিনি বাংলায় যে কাহিনী ও গল্পগুলি লিখেছিলেন তার উপাদান থেকে ক্রাইমের খাদ বাদ দিতে পারেননি। একটি ছাড়া তাঁর সব বাংলা উপন্যাস-গল্পেই ক্রাইমের অংশ অথবা স্পর্শ কিছু না কিছু আছে। তবে তখনকার দিনের সমাজচেতনায় এরকম ক্রাইম দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত না ; ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত অথবা দলগত অসদাচরণ বলেই সহ্য করা হত। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-ভাবনা ছিল সামাজিক বা পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসের অনুগত। তাই কাহিনীর পরিণতি শাস্তিতে নয়, শান্তিতে।

যে বইটিতে ব্যতিক্রম আছে তা হল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। বইটির আরম্ভে এক বড় ক্রাইম-জালিয়াতি, আর শেষে আরো বড়ো ক্রাইম—খুনখারাপি। প্রথম ক্রাইমটি তিনি ব্যক্তিগত কারণে চাপা দিয়ে গেছেন। আর শেষের কাহিনীতে তিনি থানাপুলিশ অবধি পৌঁছবার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মটো ছিল ধর্মানুগতি। তাই তিনি সেই ক্রিমিন্যালকে ধর্মারণ্যে নিরুদ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ ক্রাইম সাহিত্যের

ইতিহাস আলোচনার পক্ষে মূল্যবান নয়। তবে সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। যেমন 'বিদ্যাসুন্দর' পাঁচালীর প্রারম্ভে গণেশের অথবা সরস্বতীর বন্দনা

বাস্তব ও অবাস্তব ডিটেকটিভ কাহিনীর সূত্রপাত রীতিমতো করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)। ইনি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে কাজ করেছিলেন তেত্রিশ বছর ধরে। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালের ১৫ই মে তারিখে। আত্মজীবনীর (১৩১৮) উপক্রমণিকায় প্রিয়নাথ এই কথা লিখেছেন—'দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ পুলিশের কার্য করিয়া যে সকল মর্কদমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় 'দারোগার দপ্তরে' প্রকাশ করিয়া থাকি।'

'দারোগার দপ্তর' মাসে মাসে বেরোত। প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায়ই একটি করে কাহিনী থাকত। প্রত্যেক সংখ্যায় পত্রসংখ্যা ৪০ থেকে ৪৮-এর মধ্যে। প্রিয়নাথের উদ্ধৃত উক্তি থেকে জানা যাবে যে তাঁর অবসরগ্রহণের সময়েও পত্রিকাটি চালু ছিল। আমি ১৩১৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত দেখেছি। বইটির নাম 'প্রতিশোধ', সংখ্যা ১৭৯ পঞ্চদশ বর্ষ।

'দারোগার দপ্তরে'র প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩০০ সালে (১৮৯৩)। অনেকেই তা কিনতেন। কি শহরে কি গাঁয়ে সর্বত্র শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর ঘরে এর দু চার সংখ্যা দেখা যেত।

'দারোগার দপ্তর' পুলিশী কাহিনীর এবং সেই স্বাদের রোমাঞ্চক ক্রাইম সত্য-কাহিনীর মালা। এর কার্যালয় ছিল বৈঠকখানায় ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট। 'দারোগার দপ্তর' ছাড়াও কিছু কিছু গোয়েন্দা কাহিনী এই কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হত। এমনি একটি ডিটেকটিভ কাহিনী হল 'কাল পরিণয়' (১৯০২)।

প্রিয়নাথের নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় অবলম্বনে 'দারোগার দপ্তরে' প্রকাশিত একটি গোয়েন্দা কাহিনীর নাম 'দীর্ঘকেশী'।

এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দারোগার দপ্তর' ১৫৯তম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩১৩)। কাহিনীটিতে খাঁটি কলকাত্তাই ছাপ আছে। গল্পটি গোয়েন্দা কাহিনী হিসাবে যেমন, কলকাতার টোপোগ্রাফির দিক দিয়েও তেমনি চিত্তাকর্ষক।

দীর্ঘকেশী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার মারকুইস স্কোয়ার নামক স্থানটী কলিকাতার পাঠকবর্গের নিকট উত্তম রূপে পরিচিত। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের পার্শ্বে ঐ বৃহৎ স্কোয়ার স্কুল ও কলেজের বালকগণের ক্রীড়াস্থল। ঐ স্থানটির এখনও নাম আছে দীঘিপাড়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ঐস্থানে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ছিল, ঐ পুষ্করিণীর নাম ছিল দীঘি। ঐ দীঘিকে এখন স্কোয়ারে পরিণত করা হইয়াছে। ঐ দীঘির চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান সকল দীঘির পাড় বা দীঘির পাড়া নামে অভিহিত হইত। ঐ স্থানে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা সমস্তই প্রায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও চোর ও বদমায়েস। ঐ স্থানে কোন ভদ্র মুসলমানকে বাস কবিতে আমি দেখি নাই।

ঐ পুষ্করিণীর জল অতিশয় গভীর ছিল ও উহার উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঐ পুষ্করিণীর জলে আপনার প্রতিবিম্বকে প্রতিভাত

করিত, এবং বর্ষাকালে অর্থাৎ যে সময় ঐ পুষ্করিণীর জল বর্দ্ধিত হইত সেই সময় ঐ বৃক্ষের দুই একটি শাখাও ঐ জলের মধ্যে অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিত।

এক দিবস প্রত্যূষে সংবাদ আসিল যে ঐ দীঘির জলের মধ্যে একটি মনুষ্যমস্তক দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম, আলুলায়িত কেশযুক্ত একটি মনুষ্যমস্তক, পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের একটি অঙ্গের নিমগ্ন শাখায় সংলগ্ন হইয়া জলের মধ্যে ভাসিতেছে।

ঐ মৃতদেহ উপরে উঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ডোম ডাকাইয়া ঐ মৃতদেহ ধীরে ধীরে তীরে আনিতে কহিলাম। উহারা আদেশ প্রতিপালন করিতে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সাহায্যে সেই স্থানে গমন করিল।

ডোম ঐ মস্তক পুষ্করিণীর তীরে উঠাইয়া আনিল। দেখিলাম, উহা প্রকৃতই একটি স্ত্রীলোকের মস্তক, কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা উহাকে উহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে; ও উহার নাক মুখ প্রভৃতি স্থানে এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে যে ইহার মুখ দেখিয়া সহসা কেহই চিনিতে পারিবে না যে উহা কাহার মস্তক। তথাপি ঐ মস্তকটি দেখিয়া অনুমান হয় যে, ঐ স্ত্রীলোকটি কোন দরিদ্র ঘরের কন্যা বা বনিতা ছিল না, ও বিশেষ রূপবতীই ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। মস্তকের কেশরাশি অতিশয় ঘন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ।

মস্তকটী পুষ্করিণীর ভিতর প্রাপ্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই মনে হইল যে, মৃতদেহটীও নিশ্চয়ই ঐরূপে পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। কতকগুলি জেলিয়াকে ধরিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাল সমেত ঐ পুষ্করিণীর ভিতর নামাইয়া দিলাম। পুষ্করিণীটি বহু পুরাতন ছিল, সুতরাং উহার জল নানারূপ পুরাতন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বহু বৎসরের মধ্যে ঐ পুষ্করিণীর যে কোনরূপ পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল ইহা অনুমান হয় না। জেলিয়াগণ তাহাদের সাধ্যমত ঐ পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু মৃতদেহের কোনরূপই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না।

আমরা যে স্ত্রীর মুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা দেখিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না যে, চিনিতে পারে উহা কাহার মস্তক। উহা যে কাহার মস্তক তাহা জানিবার উপায়ের মধ্যে কেবল একমাত্র তাহার দীর্ঘ কেশরাশি। এখন আমাদের একমাত্র ভরসার মধ্যে এই রহিল যে, যদি কেহ বলে—কোন দীর্ঘকেশী সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হলে আমাদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক বা না হউক, অনুসন্ধান করিবার কতকটা রাস্তা হইবে।

ইহার এক ঘণ্টা পরেই ঐ মস্তক ও তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশির বর্ণনযুক্ত বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়া সহর ও সহরতলীর প্রত্যেক থানায় প্রেরিত হইল। উহাতে এরূপ আদেশ রহিল যে, ঢোল মোহরতের দ্বারা এই সংবাদ প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় ও প্রত্যেক গলিতে গলিতে এরূপভাবে প্রচারিত করা হউক, যেন এই বিষয় জানিতে কাহারও বাকী না থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই সংবাদ যে দিবস প্রচারিত হইল, সেই দিবস কোন স্ত্রীলোকেরই অনুপস্থিতি

সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম না ; কিন্তু পর দিবস এক এক করিয়া তিনটী ও তৎপর দিবস দুইটী নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম।

এই পাঁচটী দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের নিরুদ্দেশের সংবাদ যাহারা প্রদান করিয়াছল, সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে আনাইয়া সেই দীর্ঘ কেশযুক্ত ছিন্ন মস্তক দেখাইলাম, কেহই সবিশেষ চিনিতে পারিল না।

মৃত স্ত্রীলোকের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাউক বা না যাউক অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের অনুসন্ধানে যখন হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে দিবস ঐ মস্তক পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিবস ও তাহার পর তিন দিবস ঐরূপ গোলযোগে কাটিয়া গেল ; পঞ্চম দিবস প্রত্যুষে সংবাদ পাইলাম যে, পূর্ব্বকথিত পুষ্করিণীর মধ্যে কি একটা ভাসিতেছে।

এই কলিকাতা সহরের গতি, পাঠকগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন, কোন পুলিস কর্ম্মচারী কোন কার্য্য উপলক্ষে কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলে বিনা উদ্দেশ্যে শত শত লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, বলা বাহুল্য, আমি সেই পুষ্করিণীর ধারে গমন করিলে শত শত লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। জলের মধ্যে ঐ পদার্থটীকে দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহই স্থির করিতে পারিল না যে উহা কি, কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, কোন একটি পদার্থ ঐ স্থানে রহিয়াছে, এই অবস্থা দেখিয়া আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কোন এক সাহসী ব্যক্তি আছে, যে সাঁতার দিয়া ঐ স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারে ঐ পদার্থটি কি ?

তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমি তাহাদিগকে ঐ স্থানে যাইতে কহিলাম, তাহারাও সন্তরণ দিয়া ক্রমে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু উহার সন্নিকটবর্তী না হইয়া প্রায় দশ ফিট ব্যবধান হইতে উভয়েই প্রত্যাগমন করিল ও কহিল আমরা উহার নিকটে যাইতে পারিলাম না ও বুঝিতে পারিলাম না যে, উহা কি ? দুইজন ডুবারিকে আনিবার নিমিত্ত একটী লোক পাঠাইয়া দিলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে উহারা আমাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। উহারা উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানের জল কর্দ্দমময় হইয়া গেল, সুতরাং ঐ স্থানে যে কি আছে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। উহাদিগকে জল হইতে উঠিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে পদার্থটি আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা তোমরা দেখিতে পাইয়াছ কি ?

ডুবারি। হাঁ মহাশয়, পাইয়াছি।

আমি। ইহা কি পদার্থ বলিয়া অনুমান হয় ?

ডুবারি। বোধ হইতেছে উহা মৃতদেহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার কথা শুনিয়া ডুবারিদ্বয় বহু কষ্টে ঐ মৃতদেহটী জল হইতে তীরে উঠাইয়া

দিল। দেখিলাম, উহা একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ কিন্তু বিবর্জ্জিত মস্তক। আরও দেখিলাম, ঐ মস্তকহীন মৃতদেহের সহিত তিনটি জলপূর্ণ বৃহৎ কলসি রজ্জু দ্বারা তিন স্থানে বাঁধা আছে, কিন্তু মৃতদেহটী এরূপভাবে পচিয়া গিয়াছে যে, তাহার যে স্থানে হস্ত স্পর্শিত হইতেছে, সেই স্থানের মাংস গলিয়া পড়িতেছে ; ও উহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, সেই স্থানে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করিতে পারে কাহার সাধ্য।

পূর্ব্বে আমরা এই পুষ্করিণীতে দেহবিহীন স্ত্রীমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন মস্তকবিহীন স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, যাহার মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এ তাহারই দেহ। আমাদিগের একজন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতেই দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক পাওয়া গিয়াছিল না ?

আমি। হাঁ।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। এ মস্তকহীন দেহটীও স্ত্রীলোকের দেখিতেছি।

আমি। হাঁ, ইহা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

ঊ-ক। পূর্ব্বে যে মস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহা কি ইহারই মস্তক বলিয়া অনুমান হয় ?

আমি। অনুমান কেন, উহা যে ইহারই মস্তক, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঊ-ক। এই মৃতদেহের সহিত এরূপ জলপূর্ণ কলসী বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি ?

আমি। যাহাতে মৃতদেহটী সহজে ভাসিয়া উঠিতে না পারে, তাহার জন্যই উহার সহিত এইরূপে জলপূর্ণ কলসী বাঁধিয়া দিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ক্যানিং স্ট্রীট পাঠকগণের মধ্যে কাহারও অপরিচিত নহে। ঐ স্থান বাণিজ্য কার্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। ঐ রাস্তার দুই ধারে সারি সারি দোকান, সূর্য্যোদয়ের পর হইতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত ঐ সকল দোকানে যেমন কেনা-বেচার বিরাম নাই, সেইরূপ লোক যাতায়াতেরও কিছুমাত্র কমবেশী নাই। দোকানগুলি দেখিয়া নিতান্ত সামান্য দোকান বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু যাঁহারা উহাদিগের ভিতরের অবস্থা জানেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ঐ সকল দোকানের মূলধন কম নহে, ও উহাদিগের নিকট হইতে যে কোন দ্রব্য পরিমাণ মত চাহিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে। দোকানের সুদূরবর্তী স্থানে গলির ভিতরে প্রত্যেক দোকানদারের দুই চারিটী করিয়া গুদাম আছে, ঐ সকল গুদাম দোকানের বিক্রেয় দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ, যেমন কোন একটী দ্রব্য কম পড়িতেছে, অমনি ঐ সকল গুদাম হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনাইয়া ঐ সকল স্থান পূর্ণ করিয়া রাখা হইতেছে।

ঐ স্থানের একজন ব্রাহ্মণ দোকানদারের সহিত আমার পরিচয় ছিল, পরিচয়ই বা বলি কেন, তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সময় সময় আমি তাহার দোকানে গিয়া বসিতাম ও দোকানের বেচাকেনার অবস্থা দেখিতে দেখিতে দুই এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিতাম। যে দিবস মস্তক-বিবর্জ্জিত স্ত্রীলোকের মৃতদহ পুষ্করিণীর

মধ্য হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার তিন চারি দিবস পরে আমি আমার সেই বন্ধুর দোকানে গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, অতি অল্প মাত্রই আছে। সেই সময় ঐ দোকান হইতে রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত একটি দ্বিতল বাড়ীর ছাদের উপর হঠাৎ আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, ছাদের উপর দুইটী স্ত্রীলোক পদচারণ করিতেছে। একটীকে দেখিয়া অনুমান হয় যে, তাহার বয়স হইয়াছে। বোধ হয়, তাহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসরের কম নহে। অপরটী অল্পবয়স্কা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়ঃক্রম ১৬/১৭ বৎসরের অধিক হইবে না। উভয়েই আলুলায়িত কেশা। যে দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত ছিলাম, ইহাদিগের কেশের দৈর্ঘ্যতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, দেখিতেও প্রায় সেইরূপ। উভয়েই ছাদেব উপর বেড়াইতেছে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া অনুমান হইতেছে, ঐ কেশরাশী তাহাদিগের পদ স্পৃষ্ট করিয়া আছে। উভয় স্ত্রীলোকের কেশের সাদৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল, যে দীর্ঘকেশীর মৃতদেহ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাহার অনুসন্ধানে অনর্থক কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকের সহিত এই দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকদ্বয়ের কোনরূপ সংশ্রব আছে কি? স্ত্রীলোকটি যে কে ছিল তাহার কোনরূপ সন্ধান কি ইহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইব না? এরূপ হইতে পারে, সেই স্ত্রীলোকটি ইহাদিগের কেহ না কেহ হইবে। দুইটী স্ত্রীলোকের চুলের ভাব যখন একই রূপ দেখিতেছি, তখন বোধ হইতেছে, ইহাদিগের বংশই এইরূপ দীর্ঘকেশী ও মৃতা স্ত্রীলোকটীও হয়ত ইহাদিগের কেহ না কেহ হইবে। এরূপ স্ত্রীলোকদ্বয় যখন হঠাৎ আমার নয়নগোচর হইল, তখন বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া আমি আমার সেই দোকানদার বন্ধুকে কহিলাম, দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের ঐরূপ কেশ আর কখন দেখিয়াছ কি?

বন্ধু। দেখিব না কেন? আমি ত প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। কেন, তুমি কি ইতিপূর্ব্বে ইহাদিগকে আর কখন দেখ নাই?

আমি। না, দেখিলে আর আমি তোমাকে বলিব কেন?

বন্ধু। তুমি তো প্রায়ই আমার দোকানে আসিয়া থাক, আর উহারাও প্রায়ই ছাদের উপর বেড়াইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত কি উহারা তোমার নয়নপথে কখন পতিত হয় নাই?

আমি। না, আজই আমি উহাদিগকে প্রথম দেখিলাম। উহারা কাহারা তুমি কিছু অবগত আছ কি?

বন্ধু। আছি। যে বাড়ীতে দুইটী দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোক দেখিয়া তুমি হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ, ঐ বাড়ীটীও আমার একটি গুদাম। বাড়ীর একতলায় যতগুলি ঘর আছে সমস্তগুলিই আমার গুদাম। উহারা দোতালায় বাস করিয়া থাকে, নীচের তলার সহিত উহাদিগের কোনরূপ সংস্রব নাই।

আমি। তাহা হইলে ঐ বাড়ীতে তুমি সর্ব্বদাই গিয়া থাক? উহাদিগের সহিত নিশ্চয়ই তোমার আলাপ-পরিচয় আছে?

বন্ধু। বন্ধুত্ব আছে।

আমি। উহারা কি লোক?

বন্ধু। ইহুঁদি।

আমি। এই বাড়ীতে উহারা কত দিন হইতে আছে ?

বন্ধু। বহুকাল আছে, বোধহয় বিশ বৎসরের কম হইবে না।

আমি। উহারা কাহারা বা কি কার্য্য করিয়া থাকে ?

বন্ধু। উহারা একরূপ হাফ্ বেশ্যা, গৃহস্থের ধরনে বাস করে বটে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি করিতেও সঙ্কুচিত হয় না।

আমি। উহারা কয়জন এই বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে ?

বন্ধু। পুরুষের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ইহুঁদি। ঐ যে প্রবীণা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছ, সে উহাকেই আপনার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু উহাকে ঐ বৃদ্ধের স্ত্রী বলিয়া আমার বোধ হয় না, কারণ অপর পুরুষদিগের সহিত উহার সম্মুখে আমোদ আহ্লাদ করিতেও আমি দেখিয়াছি।

আমি। অপর স্ত্রীলোকটী কে ?

বন্ধু। ঐ প্রবীণার কন্যা।

আমি। উহারা কয় সহোদরা ?

বন্ধ। আমি উহাদিগের দুই ভগ্নীকে দেখিয়াছি।

আমি। দুই ভগ্নীই কি এই বাড়ীতে থাকে ?

বন্ধু। যেটীকে দেখিতে পাইতেছ, সে এই বাড়ীতেই তাহার মাতার সহিত বাস করে।

আমি। উহার অপর ভগ্নী কি এখানে থাকে না ?

বন্ধু। শুনিয়াছি সে কলুটোলায় থাকে। কলুটোলায় একজন চামড়ার মহাজন তাহাকে রাখিয়াছে, তাহারই সহিত সে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

আমি। বৃদ্ধ ইহুঁদি তোমার নিকট পরিচিত ?

বন্ধু। খুব পরিচিত। সে উহার ভাড়া আমাকেই প্রদান করিয়া থাকে এরূপ অবস্থায় বোধহয় আমি বলিতে পারি যে উহারা আমার প্রজা।

আমি। ঐ বৃদ্ধ ইহুঁদিকে যদি তুমি কোনরূপ উপরোধ কর, তাহা হলে বোধহয় সে অনায়াসে শুনিতে পারে ?

বন্ধু। পারে বলিয়া তো আমার বিশ্বাস।

আমি। আমি তাহাকে একটী সামান্য উপরোধ করিতে চাই।

বন্ধু। কি উপরোধ ?

আমি। সে একবার কলুটোলায় গিয়া দেখিয়া আসে যে তাহার কন্যা সেই স্থানে আছে কিনা, আর যদি না থাকে, তাহা হইলে এখন সে কোথায় তাহা যদি জানিতে পারে।

বন্ধু। ইহা জানিবার প্রয়োজন কি ?

আমি। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আর আমি বলিব কেন, সে যদি ঐ স্থানে না থাকে, তাহা হইলে আমার যে কি প্রয়োজন তাহার সমস্ত কথা তোমার নিকট বলিব।

বন্ধু। আর সে যদি ঐ স্থানে থাকে।

আমি। তাহা হলেও যদি জানিতে চাও তবে বলিব ?

বন্ধুর কথা শুনিয়া তাহার সেই কর্ম্মচারী ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ও দেখিতে দেখিতে সেই বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানে আমার বন্ধুর নিকট আনিয়া

উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ইহুঁদি সেই স্থানে আসিয়াই আমার সেই বন্ধুকে কহিল,"আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন ?"

বন্ধু। হাঁ। আপনার বড় কন্যাটিকে অনেক দিবস দেখি নাই। তিনি এখন কোথায় ?

বৃদ্ধ। কলুটোলায় আছে।

বন্ধু। আপনি তাহাকে কত দিবস দেখেন নাই ?

বৃদ্ধ। প্রায় ১৫ দিবস হইল সে আমার এখানে আসিয়াছিল, সেই সময় আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই।

বন্ধু। তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আপনি একবার সেই স্থানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন ও জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, কোন্ সময় আমি সেই স্থানে গমন করিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

বৃদ্ধ। এ অতি সামান্য কথা, যে স্থানে আমার কন্যা থাকে সেই স্থান এখান হইতে বহু দূরবর্তী নহে, বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব।

বন্ধু। আর যদি তাহার সাক্ষাৎ না পান ?

বৃদ্ধ। তাহা হইলেও আমি সেই সংবাদ আপনাকে প্রদান করিব। এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই দোকান হইতেই কলুটোলা অভিমুখে গমন করিল। মুরগিহাটা হইতে কলুটোলা বহুদূর ব্যবধান নহে, তাহা কলিকাতার পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় আমি সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই সময় আমার বন্ধু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ইহুঁদি স্ত্রীলোকটির জন্য এত অনুসন্ধান করিতেছেন কেন ?

আমি। দীঘির পাড়ায় একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এ কথা তুমি শুন নাই কি ?

বন্ধু। শুনিয়াছি।

আমি। যে দুইটী স্ত্রীলোক,ছাদের উপর বেড়াইতেছে,তাহাদিগকে মস্তকের চুলের সহিত সাদৃশে মৃত স্ত্রীলোকটীর অনুসন্ধান করিতেছি।

বন্ধু। তোমার উদ্দেশ্য এখন আমি বুঝিতে পারিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার সেই দোকানদার বন্ধুর দোকানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকিবার পর সেই বৃদ্ধ ইহুঁদি একাকী প্রত্যাগমন করিল। তাহাকে দেখিয়া আমার বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়াছেন ?"

বৃদ্ধ। হাঁ মহাশয়।

বন্ধ। আপনার কন্যার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে ?

বৃদ্ধ। না।

বন্ধু। কেন সাক্ষাৎ হইল না ?

বৃদ্ধ। তিনি বাড়ীতে নাই।

বন্ধু। কোথায় গিয়াছে ?

বৃদ্ধ। তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

বন্ধু। এ কিরূপ কথা হইল ?

বৃদ্ধ। ইহা যে কিরূপ কথা তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না।

বন্ধু। চামড়ার সওদাগরের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

বৃদ্ধ। হইয়াছিল।

বন্ধু। তিনি কি কহিলেন ?

বৃদ্ধ। তাহার কথা শুনিয়া আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বন্ধু। সে কেমন কথা ?

বৃদ্ধ। তিনি কহিলেন, আজ কয়েক দিবস হইল তাহার সহিত আমার কন্যার কোন একটি সামান্য কথা লইয়া একটু মনোবিবাদ হয়। এই কারণে রাগ করিয়া রাত্রিযোগে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তিনিও রাগ করিয়া তাহার আর কোন সন্ধান করেন নাই, কারণ তিনিও ভাবিয়াছেন যে, আমার কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে।

যে স্ত্রীলোকদ্বয়ের চুলের বাহার দূর হইতে দেখিতেছিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই বৃদ্ধ ইহুঁদী আমার বন্ধুর দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় আমি উহাদিগের চুলগুচ্ছ বিশেষরূপে দর্শন করিলাম, ও বুঝিলাম, এ চুলের সহিত সেই ছিন্নমস্তকের চুলের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তখন বুঝিলাম, আমার উদ্দেশ্য অনেকদূর সফল হইয়াছে ; ঐ মৃতদেহ এই বৃদ্ধ ইহুঁদীর জ্যেষ্ঠ কন্যার দেহ ভিন্ন অপর কাহারও নহে।

বৃদ্ধ। আপনারা আমার কন্যা সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত আছেন কি ?

বন্ধু। না।

বৃদ্ধ। আপনার কি প্রয়োজন ছিল মহাশয় ?

আমি। যে প্রয়োজন, তাহা বলিবার সময় এখন নাই।

বৃদ্ধ। কেন মহাশয় ?

আমি। কারণ আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই।

বৃদ্ধ। আমার কন্যার সহিত কি আপনার পরিচয় আছে ?

আমি। না, পরিচয় না থাকিলেও তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

বৃদ্ধ। কেন মহাশয়, তাহার সহিত কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

আমি। পারেন।

বৃদ্ধ। তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন না মহাশয়।

আমি। বলিতেছি, কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে, আমি আপনাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহার উত্তর প্রদান করেন।

বৃদ্ধ। জিজ্ঞাসা করুন, আমি যাহা কিছু অবগত আছি তাহার উত্তর এখনই প্রদান করিতেছি।

আমি। যে মুসলমানটীর নিকট আপনার কন্যা ছিলেন, তিনি কি কর্ম্ম করিয়া

থাকেন ?

বৃদ্ধ। তিনি চামড়ার ব্যবসা করিয়া থাকেন। তিনি খুব বড় মানুষ, অনেক টাকাকড়ি আছে, ও বড় মানুষেরা যেরূপ ভাবে থাকে তিনিও সেইরূপভাবে দিনযাপন করিয়া থাকেন।

আমি। তাহা হইলে আপনার কন্যার সহিত ঐ চামড়াওয়ালার বিবাহ, বা নিকা প্রভৃতি কিছুই হয় নাই ?

বৃদ্ধ। না।

আমি। সে বাড়ীতে অন্য কে থাকিত ?

বৃদ্ধ। চাকর চাক্‌রাণী ব্যতীত আর কেহই সে বাড়ীতে থাকিত না। তবে রাত্রির অধিকাংশই চামড়াওয়ালা সেই স্থানে অবস্থান করিতেন।

আমি। ঐ বাড়ীতে কয়টী চাকর থাকিত ?

বৃদ্ধ। দুইটী দরয়ান, একটী দাই ও একটী বাবুর্চিকেই প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম।

আমি। ঐ সমস্ত চাকরদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

বৃদ্ধ। না, কোন চাকরকেই দেখিতে পাই নাই।

আমি। আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলেন ?

বৃদ্ধ। না, বাহির হইতে দেখিলাম, দরজায় তালাবন্ধ।

আমি। তাহা হইলে চামড়াওয়ালার সহিত আপনার কি রূপে ও কোথায় সাক্ষাৎ হইল ?

বৃদ্ধ। যখন ঐ বাড়ী তালাবন্ধ আছে দেখিলাম, তখন আমি তাহার চামড়ার আড়তে গমন করি। সেই স্থানে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, ও সেই সময় জানিতে পারি যে, আমার কন্যা রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আমি। আপনার কন্যা উহার আশ্রয়ে কত দিবস হইতে বাস করিতেছে ?

বৃদ্ধ। প্রায় ৫/৬ মাস হইতে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ ইহুঁদি আমার কথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার কন্যা সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত আছেন কি ?"

আমি। বোধ হয় কিছু অবগত আছি।

বৃদ্ধ। কি অবগত আছেন মহাশয় ?

আমি। আপনার সেই কন্যা দেখিতে খুব সুন্দরী।

বৃদ্ধ। তাহা ত সকলেই জানে। আমার এই কন্যা অপেক্ষাও অনেকে তাহাকে সুন্দরী কহিয়া থাকে।

আমি। তাহার মস্তকের চুলের খুব বাহার আছে ও খুব দীর্ঘ। আমি সে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই কথা বলিতেছি তাহা যে কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ কোন বিষয় বিশেষরূপ অবগত না হইয়াও তাহাকে কোনরূপ অপ্রিয় সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বৃদ্ধ। অপ্রিয় সংবাদ! কি অপ্রিয় সংবাদ?

আমি। আজ কয়েক দিবস অতীত হইল, কলুটোলার নিকটবর্ত্তী দীঘির ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোকের মস্তক ও পরিশেষে মস্তকবিহীন একটী স্ত্রীলোকের দেহ পাওয়া যায়, একথা আপনি বোধহয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন?

বৃদ্ধ। না, আমি তাহা শুনি নাই। কোথায় উহা পাওয়া গিয়াছে বলিলেন?

আমি। কলুটোলার কিছুদূর পূর্ব্বে যে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘি আছে, তাহারই মধ্যে।

বৃদ্ধ। আমি ঐ দীঘি জানি, যে স্থানে চামড়াওয়ালা আমার কন্যাকে রাখিয়াছিল, সেই স্থান হইতে ঐ দীঘি বহুদূরবর্তী নহে। যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কি আপনি দেখিয়াছেন?

আমি। দেখিয়াছি।

বৃদ্ধ। উহাকে দেখিতে আমার এই কন্যাটীর ন্যায় কি?

আমি। আপনার এই কন্যার চুলের ন্যায়। চুল সমেত মস্তক এখনও রক্ষিত আছে, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি উহা আপনাকে দেখাইতে পারি।

আমার এই শেষ কথা শুনিবামাত্র সেই বৃদ্ধ,তাহার স্ত্রী ও কন্যা আমাকে সেই স্থানে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে দিল না। উহাদিগের নিজের গাড়ী ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ী আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিল, ও আমাকে তাহাদিগের গাড়ীতে লইয়া যে স্থানে ঐ মস্তক রক্ষিত ছিল সেই স্থানে যাইতে কহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল সেই চামড়াওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা। তাহার সেই বাড়ীর ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা, ও সেই বাড়ীতে যে সকল দাস-দাসী ও দারোয়ান ছিল অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে বাহির করা।

চামড়াওয়ালা ধৃত হইল। যে ঘর ভাড়া করিয়া চামড়াওয়ালা ঐ স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়াছিল সেই ঘরের তালা খুলিয়া সেই ঘরের ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার ভিতর আমাদিগের প্রয়োজন উপযোগী কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে ঐ ঘর উত্তমরূপে ধৌত করা হইয়াছে, ও দেওয়ালে নূতন কলিচুন ফিরান হইয়াছে। ঘরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে আরও সন্দেহ হইল। ভবিলাম, সেই ঘরেই ঐ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছিল, ও স্থানে স্থানে বোধহয় রক্তের চিহ্ন লাগিয়াছিল বলিয়া নূতন করিয়া উহাতে চুন ফিরান হইয়াছে।

চামড়াওয়ালা ঐ স্ত্রীলোকটীকে যে রাখিয়াছিল, তাহা সে স্বীকার করিল। অধিকন্তু যে সকল চাকর তাহার ঐ বাড়ীতে কার্য্য করিত, অপরাপর কর্ম্মচারীগণ এক এক করিয়া তাহাদিগের সকলকেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন।

ঐ সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সমস্ত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে ঐ স্ত্রীলোকটী যদিও চামড়াওয়ালা কর্ত্তৃক রক্ষিতা ছিল, তথাপি সে তাহার স্বভাবগুণে গুপ্ত ভাবে অপর লোককে তাহার ঘরে স্থান প্রদান করিত। হঠাৎ একদিবস যে সময় লোকটী সেই

স্ত্রীলোকের ঘরে উপবেশন করিয়া আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত ছিল, অথচ সেই সময় ঐ চামড়াওয়ালার সেই স্থানে আসিবার কোন কারণই ছিল না, সেই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে সেই চামড়াওয়ালা সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইল ও সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। সেই অপরিচিত লোকটী পালায়ন করিয়া যদিচ আপন প্রাণ রক্ষা করিল, ঐ স্ত্রীলোকটী তাহার হস্ত হইতে আর কোনরূপেই পরিত্রাণ পাইল না, ইহজীবনের নিমিত্ত তাহার ইহলীলা সেইখানেই শেষ হইয়া গেল।

চামড়াওয়ালার লোকজনের অভাব ছিল না, সুতরাং রাত্রিকালে ঐ মৃতদেহ দুইভাগে বিভক্ত হইল, ও যেরূপ দীঘির জলের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে উহা সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

চামড়াওয়ালা ও তাহার সাহায্যকারী সমস্ত লোকই ধৃত হইল, কিন্তু উহার অনেক অর্থের জোর ছিল, সাক্ষীগণ অনেকেই ক্রমে তাহার হস্তগত হইয়া পড়িল, ও হাইকোর্টের প্রধান প্রধান কৌন্সিলিগণের বুদ্ধিবলে ও সাক্ষীগণের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করায় সকলেই সে যাত্রা বিচারালয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

'দারোগার দপ্তরে'র প্রতি সংখ্যায় একেকটি করে কাহিনী থাকত। সংখ্যাগুলির গড়পড়তা আয়তন ছিল ষোল পেজি তিন ফর্মার অর্থাৎ আটচল্লিশ কিম্বা তার কাছাকাছি পৃষ্ঠা। দু-চারটি কাহিনীর বেলায় সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এরকম একটি কাহিনী 'মণিপুর সেনাপতি'। কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে তিন সংখ্যায় (১৩৫-১৩৭), পত্রসংখ্যা একশো তিরিশ। এক হিসাবে এ কাহিনীটির সবিশেষ গুরুত্ব আছে। সমসাময়িক ঘটনা হলেও এটি 'দারোগার দপ্তরে'র উপযুক্ত গোয়েন্দাকাহিনী নয়, স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের মহৎ জীবনের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। কাহিনীর ভূমিকায় প্রিয়নাথ যে কথা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি :

'১৮৯১ সালের ২৩শে মার্চের পূর্বে টিকেন্দ্রজিতের নাম কেহ শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আসামের চিফ-কমিসনর যদি টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা না করিতেন এবং সেই অভিযানে যদি চিফ-কমিসনর হত না হইতেন, তাহা হইলে অদ্যাপি তাহার নাম কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অনেক বন্ধুর অনুরোধে টিকেন্দ্রজিতের জীবনী লিখিত হইল। টিকেন্দ্রজিৎ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়কুল-ধুরন্ধর অর্জুনাত্মজ বভ্রুবাহন সেই বংশের আদিপুরুষ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই বংশধরগণ মণিপুরে রাজত্ব করিতেছেন : ফলতঃ মণিপুরের বিস্তৃত বিবরণী এ গ্রন্থে সম্যকরূপে বিবৃত না থাকিলেও, যে সময় হইতে ইংরাজরাজের সহিত মণিপুর রাজন্যবর্গের বন্ধুত্ব-ভাব চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। মণিপুরের বিবরণী বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

টিকেন্দ্রজিৎ ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যে সকল বীরোচিত কার্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সমালোচনায় তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। অধিকন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তীতে ক্ষত্রিয় শোণিতের যেরূপ তেজ শুনা যায়, টিকেন্দ্রজিতের শৈশব হইতে ১৮৯১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলে ইহাকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। শুদ্ধ হিন্দুসন্তান কেন, বিলাতের অনেক খ্যাতনামা মহাপুরুষেরাও টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! টিকেন্দ্রের জীবনের বীরোচিত

কার্যই তাঁহার কাল হইল। টিকেন্দ্রের সৎসাহসিকতা ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতিই তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামফল ভোগ করিবার প্রধান অস্ত্র হইল।

টিকেন্দ্রের জীবনীতে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। টিকেন্দ্রের গুরুভক্তি, পরদুঃখকাতরতা এবং ধর্মনিষ্ঠা মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণীয়। এতদ্ভিন্ন টিকেন্দ্রের জীবনী পাঠ করিয়া সকলকেই অশ্রু রিসর্জন করিতে হইবে ; কেন করিতে হইবে, তাহা আমরা এস্থলে বলিব না। পাঠক, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

পশ্চিম খণ্ডে দেখেছি যে ভিদকের বন্ধু ইউজীন সু ক্রাইম কাহিনীর মশলা নিয়ে বেশ কেচ্ছাকেলেঙ্কারির রহস্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। ঠিক কতকটা অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যেও। প্রিয়নাথকে যদি ভিদকের সঙ্গে তুলনা দিই তাহলে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে (১৮৪২-১৯১৯) ইউজীন সু'র সঙ্গে তুলনা করতে হয়। প্রিয়নাথের সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না এবং একথাও মানতে হয় যে প্রিয়নাথের অনেককাল আগে ভুবনচন্দ্র কেচ্ছাকেলেঙ্কারি ও ক্রাইম কাহিনী ঘটনা নিয়ে বড় রহস্য উপন্যাস লিখতে বা অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। একদা ভুবনচন্দ্রের রহস্য উপন্যাস 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বটতলা বইয়ের বাজারকে সরগরম করে রেখেছিল। (এ বইটির আদিরূপ 'এই এক নূতন ! আমার গুপ্তকথা' এই নামে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১-৭৩ সালের মধ্যে।) 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বইটিতে দেশী বিলাতী নানারকম কেচ্ছা ও ক্রাইম-ঘটনা খিচুড়ি পাকিয়ে এক অদ্ভুত স্বাদের রহস্য ও রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে। ভুবনচন্দ্র রেনল্ডসের অনেক রোম্যান্টিক রহস্যকাহিনীর অনুবাদ করেছিলেন। তিনি দেশী-বিলাতী রোমান্স ও ক্রাইম মিলিয়ে নিজস্ব ক্রাইম কাহিনীও সৃষ্টি করতে লাগলেন। এই রকম একটি তাঁর গোড়ার দিকের রচনা হল 'কুঞ্জবালা/ কাশ্মীর কুসুম' (১৮৯০)। বইটি নেহাৎ ছোট নয়, ঘটনাবলী বেশ অদ্ভুত—নারীহরণ, ডাকাতি, ইন্দ্রজাল, ডাকিনীবিদ্যা, তীর্থের পাণ্ডা ও সন্ন্যাসীর কেলেঙ্কারি ইত্যাদি ক্রাইম ও রহস্যঘটনার পরম্পরার খিচুড়ি। রচনারীতি মন্দ নয় তবে সেকালের কবিত্বঢঙের বাড়াবাড়ি আছে। লেখক তাঁর বিষয়বস্তুকে দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন তাই নাম দিয়েছিলেন 'কুঞ্জবালা/কাশ্মীর কুসুম'। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হয়নি। 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন' অনুধাবন যোগ্য। এটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

পাঠক মহাশয়েরা নায়ক নায়িকাচরিত উপন্যাস নবন্যাস অনেক দর্শন করিয়াছেন, বীরাঙ্গনা চরিতও অধুনা বঙ্গভাষায় বিরল-প্রচার নহে ; বলা বাহুল্য, তাহার অধিকাংশই ইংরাজীর ছায়া অবলম্বনে বিরচিত ; তাহা বলিয়াই যে সকল পুস্তকের সারবত্তা গুণের অপ্রশংসা করিতেছি অথবা লিপি মাধুর্যের অপলাপ করিবার ইচ্ছা করিতেছি, এমন আপনারা বিবেচনা করিবেন না ; বাস্তবিক, তাহার অধিকাংশই সাহিত্যসমাজের আদরণীয়—তাদৃশ গ্রন্থের অভাব নাই, সে অভাব মোচনেও আমি অগ্রসর নহি। তবে আমার এ আড়ম্বর, এ স্পৃহা কেন ? পাগলামি বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিবার অগ্রে আমার এই একটি নিবেদন, এই "কুঞ্জবালা" চরিতখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। আশা করি প্রীতি পাইবেন, আনন্দ পাইবেন, কৌতুকও পাইবেন। যদিচ ইংরাজী অথবা অপর ভাষার কোন পুস্তক ইহার

মৌলিক আশ্রয় নহে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সারাংশকেই লক্ষ্য করিয়াছে। তিনি এ পুস্তকের প্রধানা নায়িকা, কার্য-কৌশলে প্রথমাবধি তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে চিনিয়া উঠা সুকঠিন। বাস্তবিক তাঁহার কার্যকলাপ ও গতিক্রিয়া আপাতত এত বিজটিল বলিয়া বোধ হইবে যে, পাঠ করিতে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় বিভ্রম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অধিক কি, পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমান নায়কগণ ও প্রধানা নায়িকা বিনির্ণয়ে সে বিস্ময় ও বিভ্রমের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলতঃ ইহাতে প্রায় সকল রসেরই বিদ্যমানতা আছে ; তবে একটি কথা এই যে,কাশ্মীর কুসুম নামটি আপাতত সার্থক না হইতে পারে। সে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, পুস্তকের আয়তন বৃহৎ হইয়া উঠে। এই অংশ পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী যদি কতক পরিমাণে আমোদলাভ করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আগ্রহী হন, তাহা হইলে আমিও উৎসাহ লাভ করিতে পারি। সত্বর মনের আশা পূর্ণ করিয়া পুস্তকের নামটি সার্থক করিতে যত্নবান হইব।

সন ১২৯৭ সাল
৬ আষাঢ়

গ্রন্থকার

ভুবনচন্দ্র অনেকগুলি ছোটবড় বিলাতী বইয়ের কাহিনীকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এগুলির মধ্যে দুটি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি খুব বড় বই, 'ঠাকুরবাড়ির দপ্তর' বা 'অভিশপ্ত য়িহুদি' (১৩০৭)। বইটি ফরাসী লেখক ইডজীন সু-র গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। 'দি ওয়ানডারিং জু' বইটির বাংলা রূপান্তর। অপর বইটি হল মারি কোরেলি-র উপন্যাস 'সরোজ অফ স্যাটার্ন' উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর 'সন্তপ্ত শয়তান'। এ বইটি বটতলার প্রকাশন নয়। ভুবনচন্দ্রের অনুবাদ দুটিই খুব সুপাঠ্য। প্রথম বইটি 'ঠাকুরবাড়ির দপ্তরে'র বিষয় হল যীশুখৃস্টের অভিশপ্ত ত্রয়োদশ শিষ্য জুডাসের পরবর্তী চিরজীবনকাহিনী। আর দ্বিতীয় বইটির বিষয় হল জার্মান মহাকবি গেটের মহাকাব্য ফাউস্টের কাহিনী। ভুবনচন্দ্র অনূদিত তাবৎ বইয়ের মধ্যে এ দুটি বইকে শ্রেষ্ঠ বললে খুব অন্যায় হয় না। ভুবনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা', 'বঙ্গরহস্য', 'বিলাতী গুপ্তকথা' (১ম, ২য় খণ্ড) ; 'ভারতীয় রহস্য', 'রহস্য মুকুর', 'সংসার শর্বরী বা ভবকারাগারের গুপ্তকথা', 'কমলকুমারী', 'রাজাসন্ন্যাসী' ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে বটতলার হাটে বাংলা ডিটেকটিভ গল্প-কাহিনী বেশ চালু হয়েছে। ভুবনচন্দ্র সেরকম গল্প-কাহিনী কিছু লিখেছিলেন। তার একটির পরিচয় দিচ্ছি। বইটির নাম 'বাবু-চোর', একটি বড় ডিটেকটিভ গল্প। প্রকাশকাল আনুমানিক ১৯০৫ খৃস্টাব্দ। আমার জীবনে প্রথম পড়া ডিটেকটিভ গল্প এইটি, পরে অনেকবার পড়েছি। কাহিনীটি আজও আমার মনে আছে। গল্পটির সারাংশ বলছি। লিলুয়ার ভদ্রপাড়াতে ঘন ঘন ছিঁচকে চুরি হচ্ছে। পুলিশে কোনই কিনারা করতে পারছে না। পাড়ার মুরুব্বি কৈলাসবাবু খুব চিন্তিত এবং পুলিশের প্রতি ক্রুদ্ধ। একদিন তাঁর পাশের বাড়িতেই চুরি হল। পুলিশ এল। দারোগাবাবুর আগে থেকেই কিছু সন্দেহ ছিল কৈলাসবাবুর উপর। এখন দুষ্কৃতের পায়ের ছাপ মিলল ছাতে দাগরাজি করা নরম সিমেন্টের উপর। সেই সনাতন পদচিহ্ন ক্লুর সাহায্যে চোর ধরা পড়ল—কৈলাসবাবু।

ভুবনচন্দ্রের নামে বটতলায় আরো অনেক বই প্রকাশ করা হয়েছিল। সে সবই যে তাঁর লেখা বলা যায় না। কিন্তু যেগুলি তাঁরই লেখা বলে নির্ধারণ করা যায়, সেগুলির জন্য

তাঁকে বটতলার হাটের একটি বিশেষ পসারের শ্রেষ্ঠ পসারি বলে ধরতে পারি।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এবং আরো দু'একজন) বটতলার বাজারে যে উৎকট উদ্ভট রোমান্টিক কেচ্ছা-ক্রাইম কাহিনী চালু করেছিলেন তার একটা পরিণতি হয়েছিল পুরোপুরি দুশমন কাহিনীতে। এই কাহিনীগুলি আকারে কিছু বড় তবে সংখ্যায় বেশি নয়। একটি ভাল নমুনা হল হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল. প্রণীত (লেখক আলিপুরের উকীল ছিলেন) কলিকাতা রহস্য বা 'নেপাল ডাক্তারের ডায়েরী' (১৮৯৮)। বইটি বেশ আকারে বড়। বইটির প্রকৃতি কেমন তার নির্দেশ পাই নাম পৃষ্ঠায়, নামের সঙ্গে। 'নেপাল ডাক্তারের ডায়েরী' বইটির মূল যে ইংরেজী তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত যে চট করে তা বোঝা যায় না। বইটি ১২৮ ভাগে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এক একটি ভগে একটি একটি কাহিনী। কাহিনীগুলি পরস্পর সংবদ্ধ। প্রত্যেক ভাগের একটি করে নাম আছে, যেমন তৃতীয় ভাগের নাম 'সদ্‌ঠাই', পঞ্চম ভাগের নাম 'গঙ্গাতীরে' ইত্যাদি।

উচ্চসাহিত্যের লেখকের হাতে প্রথম গোয়েন্দা গল্প বেরিয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে। গল্পটির নাম 'চুরি না বাহাদুরি'। লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গল্পটি নেহাৎ খারাপ নয়, তবে যে কারণে হোক ইনি এই জাতীয় গল্প আর লেখেননি।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়া আরও একজন লেখকের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। ইনি হলেন ক্ষেত্রমোহন ঘোষ। এঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানা আছে যে এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় গৌরডাঙা গ্রামে। ক্ষেত্রমোহন সম্ভবত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একজন 'ভুয়ো লেখক' (ইংরেজীতে যাকে বলে গোস্ট রাইটার) ছিলেন। এঁর প্রথম রচিত (বা অনূদিত) ক্রাইম কাহিনী হল 'আদরিণী' (১২৯৪)।

ক্ষেত্রমোহন অনেক বই লিখেছিলেন। এঁর অনেক রচনায় ক্রাইমের ছোঁয়া অথবা পুলিশের গ্রেপ্তার আছে মাত্র। অন্যথা সেগুলিকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। ডিটেকটিভ কাহিনীগুলি মোটামুটি পুলিশী ব্যাপার। তবে এঁর বইয়ের বেশ কাটতি ছিল।

ক্ষেত্রমোহনের গ্রন্থাবলীর নাম করছি—'কাক-ভুষুণ্ডীর কাহিনী', 'কাকার কান্ড', 'চপলা', 'জালগোয়েন্দা', 'ডাকিনী', 'তিন খুন', 'দস্যু দুহিতা' (১৩১৩), 'পৈশাচিক ডাক্তার', 'পিশাচ সহোদর', 'প্রতাপচাঁদ', 'প্রভাতকুমারী' (১৩০৪), 'প্রমোদা', 'ফিরোজা বিবি' (২য় সংস্করণ ১৯০১), 'বাজীকর', 'বিপন্ন ব্যারিস্টার', 'রবার্ট ম্যাকেয়ার বা ইংলণ্ডে ফরাসী দস্যু' (এই বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল), 'বিশ্বনাথ', 'জুলেখা', বা 'যমের ফেরৎ' ইত্যাদি।

॥ ৩ ॥

দেশী-বিলাতী

অতঃপর আমরা পাই শরচ্চন্দ্র দেব (সরকার)কে। বাংলা ক্রাইম গল্প কাহিনীর পত্তনে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তরে'র পরেই তাঁর অনুসরণে ও ভদ্র সাহিত্যের ঠাটে শরচ্চন্দ্র দেব (সরকার) বার করলেন গোয়েন্দা কাহিনী পুস্তকমালা। এই মাসিক পত্রিকাটি চলেছিল ১৩০১ (১৮৯৪) থেকে ১৩০৪ (১৮৯৮) অব্দ পর্যন্ত। ইনি ইংরেজী ফার্স্টবুকের অন্যতম লেখক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের পুত্র।

প্রকাশকের 'বিনীত নিবেদন' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০২) থেকে জানা যায় যে 'গোয়েন্দা

কাহিনীর প্রত্যেক খণ্ড সপ্তাহে দুদিন করে সাময়িক পত্রের মতো ফর্মা ধরে বিক্রি হত। বিজ্ঞাপনটির অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য :

> কলিকাতার অনেক মনোহারীর দোকানে (Stationery Shop) 'গোয়েন্দা কাহিনী' বিক্রীত হয়। রাস্তায় আমাদের যে সকল লোক নগদ মূল্যে ফর্মা বিক্রয় করিত, তাহাদের মধ্যে দশ বারজন লোক, কেহ পাঁচ, কেহ সাত, কেহ দশ (নগদে বিক্রয়ের) টাকা লইয়া পলায়ন করিল দেখিয়া বাধ্য হইয়া আমাদের সে বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন আমরা প্রতি ফর্মা কলকাতার দোকানদারগণের নিকট (সকল দোকানদার নহে, যাহারা আমাদের গোয়েন্দা-কাহিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন) প্রতি সপ্তাহে দুইবার (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) প্রেরণ করিয়া থাকি। যাঁহারা ট্রামওয়ের ধারে বা রাস্তায়, ফর্মা ফর্মা নগদ মূল্যে ক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীর নিকটবর্তী দোকানে ফর্মা ফর্মা প্রাপ্ত হইবেন। অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ নাই। যাঁহাদের বাটীর কাছে ('গোয়েন্দা-কাহিনী' বিক্রেতার) দোকান নাই, তাঁহারা কার্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন, যাহাতে তথায় একজন দোকানদার ঠিক করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা হইবে। 'গোয়েন্দা-কাহিনী' এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ ফর্মা বিক্রীত হইয়াছে।

'গোয়েন্দা-কাহিনীর' আগে কোন বইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা এত বেশি ছিল না। 'গোয়েন্দ-কাহিনী' ছাপা হত কলুটোলায় ৪৯ নম্বর ফিয়ার্স লেনের মোহন প্রেসে। 'গোয়েন্দা-কাহিনীর' কার্যালয় ছিল সিমলার কাছে চোরবাগানে। পত্রিকাটির সব সংখ্যাই প্রকাশিত হত 'শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত' বলে। তবে লেখক ছিলেন অনেকে। স্বয়ং শরচ্চন্দ্র তো ছিলেনই আর ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ(?) পুত্র মণীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং সম্ভবত পাঁচকড়ি দে-ও।

যতদূর জানা যায় 'গোয়েন্দা কাহিনী' পুস্তিকামালায় এই বইগুলি পরপর বার হয়েছিল : 'সাবাস চুরি', 'উইল জাল', 'রঘু ডাকাত' (দুই খণ্ডে), 'ডবল খুন', 'চতুরে চতুরে' (দুই খণ্ডে), 'খুন না হত্যা' (তিন খণ্ডে), 'ভীষণ নরহত্যা', 'ভীষণ নারীহত্যা', 'ভ্রাতৃহত্যা', 'স্বামিহত্যা' (দুই খণ্ডে), 'বাহাদুর চোর' (দুই খণ্ডে), 'দিনে ডাকাতি', 'অদলবদল', 'এরা কি' (দুই খণ্ডে), 'গুম খুন'। এই বইগুলির মধ্যে পাঠকসমাজে সবচেয়ে সমাদৃত হয়েছিল 'রঘু ডাকাত'। পরবর্তীকালে এই বইটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হাফটোন ছবি সমেত ভালোভাবে ছাপা ও বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল (৪র্থ সংস্করণ, ১৯১৬)।

শরচ্চন্দ্রের নিজের লেখা যেমন, 'তীর্থ বিভ্রাট', 'গুম খুন' ইত্যাদি। 'গোয়েন্দা কাহিনী' উঠে যাবার পর এবং সম্ভবত ধীরেন্দ্রনাথ পালের পরলোকগমনের পর ধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং নিজ কৃত অনুবাদগুলি পরে পাঁচকড়ি দে নিজের সঙ্কলিত বলে ছাপিয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্র লেখক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন না। তিনি নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর মধ্যে 'শাক্যসিংহ প্রতিভা' বা 'বুদ্ধদেব চরিত' (আদি লীলা) নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়ে সমাদরলাভ করেছিল। শরচ্চন্দ্রের সাহিত্যকর্মে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন সুপণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সেকালে ইংরেজী শিক্ষিত ভাল ভাল লোকেরাও আগ্রহ করে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তেন। গোয়েন্দা-কাহিনীর পুস্তিকামালার উৎসর্গপত্র থেকে এই অনুমান করা যায়। প্রত্যেক সংখ্যা কোনো না কোনো বিখ্যাত পণ্ডিত বা সাহিত্যিককে উৎসর্গ করা হয়েছিল। যেমন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (চোরবাগানের শরচ্চন্দ্রের প্রতিবেশী, পৃষ্ঠপোষক ও নাট্য

শিক্ষণগুরু), নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বঙ্গমহিলার সম্পাদক), রায় বৈকুণ্ঠনাথ বাহাদুর (বসু), কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, (হাইকোর্টের) বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (শরচ্চন্দ্রের পিতার সহপাঠী), বিনয়কৃষ্ণ দেব (বাহাদুর), সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি।

বাংলা ক্রাইম কাহিনীকে ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকের হাতে তুলে দেবার কৃতিত্ব প্রধানত শরচ্চন্দ্রেরই।

এই ধরনের বটতলার গোয়েন্দা-কাহিনী লেখকের ও তাঁদের গ্রন্থের নাম করছি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রাণী সুধামুখী' (১৩০১), হরিদাস মান্না : 'হীরাপ্রভা' (১২৯৪, বড় বই) ; মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'চাঁদের হাট' (১৩২৭, ৪র্থ সংস্করণ) ; কুসুমেষু মিত্র : 'কামিনীকণ্টক' (১৩০৮) ; রমানাথ দাস : 'জালরসিক' (১৩১৬) ; সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রেলে চুরি' (১৩১৯) ; দেড়ে বাবাজী প্রণীত "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" (১২৯৪, বড় বই) ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে বটতলার গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য : কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রেনল্ড্‌সের অনেকগুলি বই বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন ; যেমন, 'রানী কৃষ্ণকামিনী' (ইয়ং ডাচেস-এর অনুবাদ), 'সৈনিক-সীমন্তিনী' (সোলজার্স ওয়াইফ-এর অনুবাদ), 'হরিদাসীর গুপ্তকথা' ('হরিদাসের গুপ্তকথা'র অনুকরণ) ইত্যাদি ; নবকুমার দত্ত, রমানাথ দাস, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নন্দন-কানন ও দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর রহস্যলহরী গ্রন্থমালা দুটি জাঁকিয়ে উঠলে পর বটতলার গোয়েন্দা-কাহিনীর ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে এল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচনা 'বিশ্বনাথ'-এর (১৮৯৬) কাহিনীর সঙ্গে 'রঘু ডাকাতে'র কাহিনীর বেশ মিল আছে। তবে নবীন লেখকদের শৌখিন কলমে ডিটেকটিভ গল্প-কাহিনীর প্রথম আবির্ভাব ঘটল কুন্তলীন পুরস্কারের মর্যাদা পেয়ে। ১৩০৩ সালের কথা। তখন স্বদেশী হাওয়া দেশে সবে বইতে শুরু করেছে। স্বদেশী কেশতৈল কুন্তলীন ও এসেন্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা হেমেন্দ্রমোহন বসু এই পুরস্কারটি প্রবর্তন করেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে। এক, নবীন গল্প লেখকদের সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া আর দুই, স্বদেশী দ্রব্যকে শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞাপিত করা। বছর বছর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হত শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের, যাঁরা তাদের গল্পের মধ্যে সুকৌশলে কুন্তলীন তৈল ও দেলখোস এসেন্সের নাম ঢুকিয়ে দিতে পারবেন।

প্রত্যেক বছরের পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পগুলি ভাল কাগজে ভাল ছাপা পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হত পূজার পূর্বে। কুন্তলীন পুরস্কারের এই বার্ষিক পুস্তিকাগুলির মধ্যেই হয়তো নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পর আমরা কিছু মৌলিক ডিটেকটিভ গল্পের নমুনা পাচ্ছি। প্রথমেই পাই চারজনের নাম। তার মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা। ১৩০৬ সালের পুরস্কার পেয়েছিলেন ডিটেকটিভ গল্প লিখে রজনীচন্দ্র দত্ত (প্রথম পুরস্কার ৩০ টাকা), দীনেন্দ্রকুমার রায় (দ্বিতীয় পুরস্কার ২০ টাকা), জগদানন্দ রায় (৭ম পুরস্কার ৫ টাকা) ও সরলাবালা দাসী (৮ম পুরস্কার ৫ টাকা)। দীনেন্দ্রকুমার রায় পরবর্তী কালে ক্রাইম কাহিনী অনুবাদ করে খ্যাতনামা হয়েছিলেন। জগদানন্দ রায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক

নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শিক্ষণকার্যেও উদ্ভিদ ও প্রাণীবৃত্তান্তের বই লিখে বেশ নাম করেছিলেন। এঁর আর একটি গল্প পরে কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল। সরলাবালা দাসী ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের ভগিনী, পরবর্তীকালে ইনি কবিতা লিখে বেশ নাম করেছিলেন। রজনীচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীহট্টে বেজুড়া গ্রামের ইস্কুলের হেডমাস্টার, এঁর আর কোনো লেখা আমি পড়িনি। নবীন লেখকের পক্ষে গল্পটি মোটেই মন্দ নয়। আমার অভিজ্ঞতায় রজনীচন্দ্রের গল্পটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পর একটি মৌলিক ডিটেকটিভ গল্প বলে এখানে পুনর্মুদ্রিত করলুম। গল্পটির নাম 'অদ্ভুত হত্যা'।

কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিয়া সে মোকদ্দমার যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দ-ট্রেনে রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করি। পরদিন প্রাতঃকালে কাগজপত্র গুছাইয়া রিপোর্টাদি লিখিয়া নিজের কোন প্রয়োজনবশতঃ জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একজন কনেষ্টবল যথারীতি লম্বা সেলাম ঠুকিয়া, একখানা সরকারী চিঠি আমার হস্তে প্রদান করিল। চিঠির উপরে লাল কালিতে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখিত "অতি দরকারী"—এ দুটি কথা সর্ব-প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কনেষ্টবলকে বিশ্রাম ঘর দেখাইয়া দিয়া ত্রস্ত হস্তে চিঠি খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। পত্রে প্রধান কর্মচারী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই—

'আজ চারি দিবস গত হইল, মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটি ছাত্রাবাসে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি ছাত্র অতি আশ্চর্যরূপে হত হইয়াছে। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত খুনের কিনারা করিতে পারে নাই। তুমি মুহূর্তমাত্র গৌণ না করিয়া উক্ত হত্যা ব্যাপারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ কর্মচারী হত্যা ব্যাপারে প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছে।'

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার বন্ধুদর্শনবাসনা পলকে বিলুপ্ত হইল। সেই কৃত্রিম মুদ্রার জটিল মোকদ্দমার গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আবার এক হত্যা কাণ্ডের গুরুতর ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে ভাবিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া কনেষ্টবলকে বিদায় দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বড়সাহেবের লিখিত পত্রের মর্ম জ্ঞাত করাইলে তিনি আমাকে উক্ত হত্যা ব্যাপারের প্রধান অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর নাম সুশীলবাবু; সুশীলবাবু আমার পূর্বপরিচিত। ইনি আমাকে হত্যা সম্বন্ধে নিজ তদন্তে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একে একে সন্তুষ্টির সহিত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। হত্যা সংক্রান্ত আমূল বিবরণ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, এ ব্যাপারের কিনারা করা বড় সহজ-সাধ্য নহে। পুলিশানুসন্ধানে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল—

"মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বিক্রমপুর অঞ্চলের বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইঁহার

পিতার নাম ৺হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ কলকাতা সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীত অধ্যয়ন করিতেন। মির্জাপুরের এক ষ্টুডেন্ট মেসে ইঁহার বাস ছিল। ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বন্ধে সেই মেসের অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিনজন বি. এ. পরীক্ষার্থীর সহিত মহেশচন্দ্র বন্ধের সময়েও সেই মেসেই ছিলেন। মেসের বাড়িটি দ্বিতল ; উপরে চারিটি ঘর, নীচে দুটি। মেসে অধিক ছাত্র না থাকায়, পড়াশুনার সুবিধার নিমিত্ত চারিটি ঘরে চারিজন ছাত্র শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নীচের একটি ঘরে রান্না এবং অপরটিতে খাওয়া-দাওয়ার কার্য সম্পন্ন হইত। মেসে এক্ষণে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাই সর্ব কার্য চালিত হয়। ব্রাহ্মণটি রাত্রে মেসে থাকে না। ২৬শে আশ্বিন রাত্রিতে, মহেশচন্দ্রকে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় সবল সুস্থ শরীরে আপন ঘরে পড়িতে দেখিয়াছেন। পর দিবস প্রত্যূষে অতুলবাবু নামে ঐ মেসেরই অন্যতম ছাত্র যখন মহেশচন্দ্রের ঘরের মধ্য দিয়া নিম্নতলে যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে ছিন্ন-কণ্ঠ, রক্তাক্ত কলেবর দেখিতে পাইয়া উচ্চ চীৎকারে সকলকে সেখানে একত্র করেন। পরে, তথায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ-মত অগৌণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া সে ঘরে একখানা রক্তরঞ্জিত বড় কাটারি ও একপাটি নাগ্‌রা জুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এগুলি ইতিপূর্বে মেসের কেহ কখন দেখে নাই। হত্যাকারীর এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অশ্চর্যের বিষয়, হত্যাগৃহের একটি সামান্য জিনিস কিম্বা একটি কপর্দ্দকও স্থানান্তর হয় নাই। মহেশের চাবি তাহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে ; উক্ত চাবি দ্বারা পুলিশ মহেশের পোর্টমেণ্ট ও হাত-বাক্স খুলিয়া টাকা পয়সা মহেশের লিখিত হিসাবের মিল মতনই পাইয়াছেন।

"মহেশের সহিত যে সে মেসে কাহারও মনোমালিন্য বা বিবাদ ছিল, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনটি ছাত্র ও ব্রাহ্মণের 'জবানবন্দী'তে হত্যার অনুসন্ধানে কার্যকরী হইতে পারে, এরূপ কোন কথাই প্রকাশ পায় না। ইঁহাদের কেহ কাহাকে মহেশের হত্যাকরী বলিয়া সন্দেহ করেন না। পরন্তু মহেশের সহিত সকলেরই সদ্ভাব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।"

পুলিশের এই রিপোর্ট দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও ছাত্রত্রয়ের জবানবন্দী আনুপূর্বিক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া অনুসন্ধানের কোন সূত্রই বাহির করিতে পারিলাম না। তবে জুতা ও কাটারিখানা দেখিতে হইল। সুশীলবাবু তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। আমি তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম, রক্তাক্ত কাটারিখানা অপূর্ব-ব্যবহৃত। জুতাখানিও একেবারে অব্যবহৃত বলিয়াই বোধ হইল। উহা পায়ে দেওয়ার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। সুতরাং এগুলি অনুসন্ধানের পক্ষে কোন সহায়তা করিবে, এরূপ মনে করিতে পারিলাম না। আমি সেখানে আর বেশি সময় অপেক্ষা না করিয়া সেই মেসটি দেখিতে মনস্থ করিলাম এবং সুশীলবাবুর সহিত সেই মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন পূজোপলক্ষে স্কুল কলেজাদি বন্ধ ছিল, সুতরাং সকলকেই বাসায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমি প্রথমে হত্যাগৃহ এবং তৎপরে মেসের অন্যান্য স্থান যথারীতি পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু হত্যা সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিশেষে আমি হত্যাগৃহে প্রথম উপস্থিত সেই অতুলবাবুকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম , এবং উত্তর আমার নোট-বহিতে লিখিয়া লইলাম।

আমি। আপনি সে দিন প্রাতেই প্রথম সে কক্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, না, রাত্রে সে কক্ষের ভিতর দিয়া আর কোন বার নীচে নামিয়া ছিলেন ?

অতুলবাবু। না, সেই প্রথম আমি সে কক্ষে প্রবেশ করি।

আমি। যে রাত্রে মহেশ খুন হয়, সে রাত্রে সর্বশেষ তাহাকে কে জীবিত দেখিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সর্বশেষ কে জীবিত দেখিয়াছিলেন মনে নাই। আমরা সকলেই একসঙ্গে নীচের ঘর হইতে উপরে আসিয়া আপন আপন কক্ষে পড়িতে বসিয়াছিলাম।

আমি। আপনারা সেদিন শয়ন করিবার পূর্বে আর নীচে যান নাই ?

অ, বাবু। আমি সেদিন আর নীচে যাই নাই।

আমি তখন আর দুজনকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন, সে রাত্রে তাঁহাদের কাহারও নীচে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনাদের মেসের ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত মহেশবাবুর বিশেষ জানাশুনা ছিল বলিয়া আপনারা জানেন ?'

অ, বাবু। মহেশবাবুর বিশেষ বন্ধু ত কেহ দেখিতে পাই না।

আমি। মহেশবাবুর কাহারও সহিত শত্রুতা বা মনোবিবাদ ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না মহাশয়, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতার কথা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমি। হত্যার দিনে মহেশবাবু সমস্ত দিবস কি মেসেই ছিলেন, না, কোথাও বাহির হইয়াছিলেন ?

অ, বাবু। (খানিক চিন্তার পর) হাঁ, মহেশবাবু সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাহিরে গিয়াছিলেন।

আমি। কোথায় গিয়াছিলেন, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি। মহশেবাবুর কি বেড়াইবার অভ্যাস ছিল ?

অ, বাবু। মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন বৈ কি।

আমি। হত্যার তারিখে কোন্ সময়ে বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন ?

অ, বাবু। বোধ হয় রাত্রি ৭৷৷টা, কি ৮টার সময়।

আমি। মহেশবাবুর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল, আপনার বিশ্বাস।

অ, বাবু। (একটু বিরক্তির সহিত) ওগুলি কি বলিব ?

আমি তখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলাম, 'দেখুন, আপনারা সকলেই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, এ হত্যার কিনারা করা বড় সহজসাধ্য নহে। কেহ অর্থলোভে এ নৃশংস কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে, অবস্থা পর্যবেক্ষণে, এমন বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ঈর্ষামূলেই বোধহয় এ লোমহর্ষক হত্যা সংশাধিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি আমি হত ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা অবগত হইতে না পারি, তবে প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধান কিরূপে করিতে সমর্থ হইব ? আর অবশ্য ইহাও আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, যদি কোন প্রকারেই এ হত্যার কূলকিনারা করা না যায়, তবে পুলিশ শেষকালে আপনাদের লইয়াই টানাহিঁচড়া করিতে পারে। কে

জানে, আপনাদের কেহ এ ব্যাপারে বিজড়িত নহেন ? এ বাড়িতে অপর কেহ বাস করে না, মহেশবাবুর সহিত অন্য কাহারও শত্রুতা ছিল না একথা আপনারাই বলিতেছেন, এমতাবস্থায় কাহার উপর প্রথম সন্দেহ দৃষ্টি পড়িতে পারে, তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারিখানি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং হত্যাকারী যে পুরাতন-পাপী নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে—একপাটী নাগরাজুতা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে ইহা আপনাদের চালাকি নয় ?—

আমি এতদূর বলিলে ছাত্রবাবুটি অপেক্ষাকৃত কাতর স্বরে বলিলেন, 'ক্ষমা করুন মহাশয়, আমি যাহা জানি, বলিতেছি। আমার বিশ্বাস মহেশবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলা যায় না।'

আমি। বামনটি কেমন, কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করিতেছে ?

অ, বাবু। অনেকদিন। বামনটি খুব বিশ্বাসী, সে আমাদের বড় যত্ন করে।

* * *

আমি। কাহার সঙ্গে, কোথায়, মহেশবাবুর আসা যাওয়া ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রির পর বাসায় আসিতেন এবং মাঝে মাঝে একটি ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত।

আমি। ঝির ঠিকানা আপনি জানেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, ঠিকানা জানি না।

আমি। ঝিকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন ?

অ, বাবু। হাঁ, পারিব বৈ কি ? হত্যার তারিখেও দিনের বেলায় ঝি তাহার নিকট আসিয়াছিল।

আমি। যে দিন হত্যার কথা জানিতে পান, সে দিন প্রথমে কে সদর দরজা খুলিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সম্ভবত সদর দরজা খোলা ছিল।

আমি। সদর দরজার খিলান তো অভগ্ন ; তবে হত্যা কিরূপে সংঘটিত হইল, আপনাদের বিশ্বাস ?

অ, বাবু। সদর দরজা মধ্যে মধ্যে খোলাও থাকে। বোধ হয় সে রাত্রে আমরা কেহ দরজা ভেজাই নাই। বামনটি চলিয়া গেলে, কোন দিন দরজা ভেজান যায়, কোন দিন বা বিপর্যয় ঘটিল না কেন ? শুনিয়াছি, মহেশের চরিত্র ভাল ছিল না, তবে কি অপর কোন মন্দ-চরিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে ? অসম্ভব কি ? কিন্তু সে ব্যক্তির অনুসন্ধান কিরূপে করিব ? মেসের কেহ ত কুচরিত্র নহে ? সদর দরজার খিলান অভগ্ন ; এমতাবস্থায় সহজে বাহিরের লোকে কিরূপে ভিতরে প্রবেশ করিবে ? কিন্তু যদি সদর দরজা সে রাত্রে খোলাই থাকে, তবে এই এক কথার উপর নির্ভর করিয়া মেসস্থ ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা ত যুক্তিযুক্ত নহে। আচ্ছা, একটা লোক একই বাড়িতে খুন হইল, আর বাড়ির অপর কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না, ইহা বা কি প্রকারের কথা ? হত্যাগৃহে একখানা নাগরা জুতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তবে কী হত্যাকারী কোন হিন্দুস্থানী ? কিন্তু তাহা হইলে জুতাখানি একেবারে

অব্যবহৃত থাকিবার কারণ কি ? এ জুতা পায়ে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ত কিছুতেই বোধ হয় না।

মেসের ছাত্র হইতে জানিলাম, একটি ঝি মহেশের কাছে যাওয়া আসা করিত, হত্যার তারিখেও আসিয়াছিল ; সে ঝি কে ? তাহার সন্ধানের উপায় কি ?—এবম্বিধ নানা প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে মনে উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পরিলাম না ; কোন সূত্রাবলম্বনে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিব, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না ; তখন অগত্যা তখনকার মত এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আজ রজনীযোগে গুপ্তভাবে মির্জাপুরের সেই ছাত্রবাসে ছাত্রদিগের কথাবার্তা শুনিতে চেষ্টা পাইব। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হত্যা ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকে কিম্বা এ সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত থাকে, তবে খুব সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যে আজ এ বিষয়ের গোপনীয় কথাবার্তা চলিতে পারে। তখন বোধহয়, হত্যা সম্বন্ধে কিছু না কিছু সন্ধান পাইতে পারিব।

এইরূপ স্থির করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে শয্যায় পড়িয়া একটু বিশ্রাম ভোগ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িল, এ হত্যা সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই। অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে এ তথ্যটি জানিয়া লওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য,—এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্বক 'ধড়াচূড়া' পরিধান করিয়া পুনরায় মুচিপাড়া থানাভিমুখে রওনা হইলাম।

যথাকালে মুচিপাড়া থানায়, পহুঁছিয়া সরকারি ডাক্তারের রিপোর্ট পাঠে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে সন্দেহ আরো বর্দ্ধিত হইল। ডাক্তার বলেন, মৃত্যুর পূর্বে হত ব্যক্তিকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে হৃতচেতন করা হইয়াছিল। পরে অজ্ঞানাবস্থায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ইহাকে হত্যা করা হইয়াছে। কি ভয়ানক কথা ! জীবিতাবস্থায় হত্যা করিলে পাছে আহত ব্যক্তির আর্তনাদে অন্যান্য লোক জাগরিত হইয়া পড়ে, এজন্য পূর্বাহ্নে সাবধান হইয়া হত্যাকারী ইহার উপর বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল ! হত্যাকারী তবে ত নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে ! মেসেরই কোন ছাত্র কি তাহা হইলে আন্তরিক বিদ্বেষবশে, গুপ্ত কারণে, অপর সকলের অজ্ঞাতে এরূপ সাবধানতা সহকারে হত্যাকাণ্ড সমাধা করিল ? সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। এ সময়ে একবার মহেশের মৃত দেহ দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। আমার কলিকাতা পহুঁছিবার বহু পূর্বেই, ডাক্তারের পরীক্ষার পর উক্ত মৃতদেহের সৎকার হইয়া গিয়াছিল।

নানা বিষয়িনী চিন্তার পর অবশেষে আমি প্রথম অনুসন্ধানকারী কর্মচারী সুশীলবাবুর সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ করিলাম। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুশীলবাবু, কি সূত্রে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিব ?' সুশীলবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সূত্র বাহির করিবার জন্যই ত টিকটিকির প্রয়োজন।' সুশীলবাবু ডিটেকটিভকে টিক্‌টিকি বলিতেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি সেদিন ঘর তল্লাসের সময় কাহারও কাছে ক্লোরোফর্ম আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি ?' সুশীল বলিলেন, 'আমরা ত তখন জানিতাম না যে হত ব্যক্তির ওপর প্রথমে ক্লোরোফর্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল।' আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, 'অনুসন্ধানের সকল সুযোগ আমি কলিকাতা আসিবার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এখন এ

অদ্ভুত হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কৃতকার্যতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।' ইহার উত্তরে সুশীলবাবু বলিলেন, 'ভাল মনে পড়িল ;—সেদিন মহেশচন্দ্রের হাতবাক্স অনুসন্ধানের সময় ইহার ভিতরের কতকগুলি চিঠিপত্র আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অবকাশাভাবে সেগুলি এ পর্যন্ত পড়ি নাই। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন, যদি কোন সূত্র বাহির হয়।' এই বলিয়া তিনি কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিঠিপত্র আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তখন আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া সেগুলি হইতে এক একখানি পত্র লইয়া আগ্রহ সহকারে আপন-মনে পড়িতে লাগিলাম। পাঁচ সাত খানি চিঠির পর একখানি চিঠি পাঠ করিয়া আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। চিঠিখানি অবিকল এইরূপ

"—নং হাড়কাটা গলি
২৬শে আশ্বিন।

প্রাণের মহেশ,

তুমি আর এখন আসিতেছ না কেন ? বিধুবাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা কি তোমার উচিত ? আজ যা হয়, একটা হইয়া যাইবে ! বিধুবাবু বাড়াবাড়ি করিলে, তাহাকে আমার কাছে আসিতে বারণ করিব। আমার কুন্তলীন একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। দেলখোস নামে নাকি এক প্রকার নূতন এসেন্স বাহির হইয়াছে, দেখিতে পাই কি ? ঝিকে পাঠাইলাম, তুমি আজ অবশ্য অবশ্য আসিবে, অন্যথা না হয়। ইতি

তোমারই ভালবাসার
নলি—।"

পত্রখানা দুইবার পড়িয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। পত্রের তারিখ দেখিয়া অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এ পত্রে ঝির সন্ধান পাইলাম। বিধুবাবু নামে কোন ব্যক্তির সহিত মহেশের মনোমালিন্য ছিল, পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে যেন অনুসন্ধানের কিছু কিছু সূত্র বাহির হইল, মনে করিলাম। আমি আর বিলম্ব না করিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িয়া একটি ফিট্ বাঙালীবাবু সাজিলাম। তাহার পর চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া, আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত গাড়োয়ানকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পদব্রজে রাস্তায় বাহির হইলাম।

৩

হাড়কাটা গলির সেই বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। আমি একেবারে 'সপাসপ' উপরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা—সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গৃহকর্ত্রী বেশভূষা পরিপাটী করিতেছে। আমি চির-পরিচিতের ন্যায় একখানা কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। যুবতী তখন আমার অভ্যর্থনার্থ তাড়াতাড়ি আপন কার্য সমাধা করিয়া ঝিকে তামাক আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল।

আমি ইত্যবসরে আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলাম, 'বিধুবাবুর এতক্ষণ এখানে আসিবার কথা ছিল। কই তিনি যে আসিলেন না!' যুবতী উত্তরচ্ছলে বলিল, 'কই, সে ত আজ কয়দিন আসিতেছে না। সেই যে সে দিন মহেশের সঙ্গে মারা মা—' এ পর্যন্ত বলিয়া যুবতী আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যেন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলাম, 'তা কাজটা কি ভাল হয়েছিল? আমি সমস্তই শুনিতে পাইয়াছি। বিধু আমার পরম বন্ধু।'

যুবতী। কই আপনাকে ত একদিনও এখানে দেখি নাই।

আমি। এতদিন আসিবার প্রয়োজন পড়ে নাই; তাই আসি নাই; কিন্তু সেদিনকার ঘটনার পর বিধু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে কখনও এখানে একাকী আসিবে না।

যুবতী। তা মহাশয়, আমার দোষ কি বলুন? বাস্তবিক, সেদিন মহেশের কাজটা ভারি অন্যায় রকমের হয়েছিল। ভদ্রলোকের গায়ে হাত তোলা, জুতো মারা, এগুলি নেহাত ছোট লোকের কর্ম।

এই বলিয়া যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত পানের খিলি দুটি আমাকে প্রদান করিল। আমি সমস্ত ব্যাপার ইতিমধ্যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতে লাগিল, এ জুতোমারা কাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে বিধুবাবু নামক ব্যক্তির পক্ষে মানসিক উত্তেজনা-প্রাবল্যে মহেশের জীবনলীলা সাঙ্গ করা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা ২৬শে আশ্বিনেরই ঘটনা। যাহা হউক, অধুনা আমার পক্ষে এই বিধুবাবুর অনুসন্ধান লওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল; কিন্তু এখানে আমি বিধুবাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছি, সুতরাং সোজাসোজি ইহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ইতিমধ্যে, ঝি-মূর্তি, একটি রূপার হুকা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এবং আমাকে দেখিয়া বলিল,—

'এটি যে নূতন বাবু!' যুবতী তদুত্তরে বলিল, 'ইনি বিধুভূষণের বিশেষ বন্ধু!'

ঝি। কোন বিধুভূষণ?

যুবতী। অ্যাঁ—নেকি? মুখুয্যে বিধু—সেই ২১ নম্বর কলুটোলার।

এতক্ষণে সহজেই আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে;—আমি ঘটনাক্রমে বিধুর ঠিকানা অবগত হইলাম। সুতরাং আর সেখানে অপেক্ষা করিবার দরকার নাই ভাবিয়া, ঝির কথার উত্তরচ্ছলে অন্যমনস্ক-ভাবে বলিলাম, 'বিধুবাবুর ত এখনই এখানে আসিবার কথা ছিল, দেরি হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তা, আমি একটু দেখিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া আমি '২১ নং কলুটোলা' ঠিকানাটি মনে রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। এবং অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় আসিয়া পহুঁছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি আসিয়া দেখি, সুশীলবাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলে, তখনই বিধুর সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত বলিয়া পরামর্শ স্থির হইল। দুই জন পুলিশ কনেষ্টবল, পুলিশ-পোষাক পরিহিত সুশীলবাবু এবং বাঙ্গালীবাবু আমি—শকটারোহণে অগৌণে কলুটোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বলিয়া রাখা ভাল, হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারি এবং নাগরা জুতা আমাদিগের সঙ্গে লইয়াছিলাম।

তাহাদিগকে গাড়িতে পথের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি একাকী সেই ২১ নং বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। এটি একটি ছোটখাট ডিস্পেনসারী। অনুসন্ধানে

জানিলাম, সুধীরবাবু নামে জনৈক ভদ্রলোক এ ডিস্পেন্সারীর স্বত্তাধিকারী। তিনি সপরিবারে ইহারই উপরতলে বাস করেন, নীচের ঘরে ডাক্তারখানা। আরো জানিলাম, সত্য সত্যই বিধুভূষণ নামে উক্ত সুধীরবাবুর এক ভাইপো এ বাড়িতে বাস করেন। তিনি এক্ষণে বেকার অবস্থায়ই আছেন।

আমি যে সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময় ডাক্তারবাবু বাসায় ছিলেন না। সুতরাং ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারকে বিধুবাবুকে সংবাদ দিতে বলিয়া নীরবে সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কম্পাউণ্ডার উপরে চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরক্ত-নয়ন, বিষাদ-বদন, রুক্ষ-কেশ এক যুবক সমভিব্যাহারে সে কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। যুবকের মুখাকৃতি ও ভাবগতি সন্দর্শনে আমার মনের দারুণ সন্দেহ একেবারে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

আমি একটু ত্রস্ততার সহিত অথচ মৃদুস্বরে যুবককে বলিলাম, 'আমি হাড়কাটা গলি হইতে আসিয়াছি। পথে গাড়িতে 'নলি' অপেক্ষা করিতেছে, আপনি একটু বাহির হইতে পারেন ?' যুবক সংক্ষেপে উত্তর করিল, 'আমি আজ বড় অসুস্থ।' আমি তখন ব্যগ্রভাবে বলিলাম, 'তবে আপনি একটু এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি তাহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।' এই বলিয়া ত্বরিতপদে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, এবং কয়েক মুহূর্তের পর দলবল সহ সুশীলকে সে বাড়িতে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়া, পুনরায় ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিলাম। এবারে তাড়াতাড়ি আসিয়াই আমি দৃঢ় মুষ্টিতে বিধুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই নাগরা জুতাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, 'দেখ দেখি বিধু, তুমি এ জুতা সেদিন রাত্রিকালে মহেশের হত্যাগৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলে কি না।'

আমার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা পাইল। তখন আমি আমার মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া বলিলাম, 'সে চেষ্টা বৃথা ; তুমি মহেশের হত্যাকারী, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।'

ইত্যবসরে কনেষ্টবলসহ সুশীলবাবু সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, এক্ষণে থানায় চলুন।'

বিধু এ সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলাম, 'দেখ, বিধু, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়য়াছি, তুমি হাড়কাটা গলিতে 'নলির' বাড়ি মহেশ কর্তৃক প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে, উত্তেজনাবশে, সেদিনই মহেশকে খুন করিয়াছ। এ বিষয়ের সমস্ত প্রমাণাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে চল, তোমাকে হাজতে লইয়া যাইব।'

আমি এতটুকু বলিয়া দেখিলাম, বিধু আমার সমস্ত কথা শুনিতেছে কি না সন্দেহ। কারণ, ক্রমে যেন তখন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

তদনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিধু, তুমি এক্ষণে কি বলিতে বা করিতে চাও ?' সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর করিল, 'মহাশয়, আমার কিছু বলিবার বা করিবার নাই। পাপ গোপনে থাকে না। পাপের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে ; চলুন, আমি কোথায় যাইব।'

আমি বলিলাম, 'তুমি হত্যাপরাধ স্বীকার করিতেছ ?' সে উত্তর করিল, 'আর মিথ্যা বলিব না ; আমি হত্যা করিয়াছি।'

আমরা সেখানে বসিয়াই উপস্থিত কতিপয় ভদ্রলোক সমক্ষে বিধুর স্বীকারোক্তি এবং তৎকর্তৃক বর্ণিত হত্যার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অবমানিত হইয়া, উত্তেজনাবশে সে এ ভীষণ কার্যে ব্রতী হইয়াছিল ; মহেশ যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, তজ্জন্য যে পূর্বাহ্নেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়াছিল ; অনুসন্ধানকারীকে বিপথে চালিত করিবার জন্য স্বেচ্ছাপূর্বক নাগরাজুতা রাখিয়া আসিয়াছিল, একে একে এ সমস্তই বিধু স্বীকার করিল। এইরূপে বিধুর জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে আমরা তাহাকে থানায় লইয়া চলিলাম।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত-হত্যার মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ হইল এবং দায়রায়, জজ সাহেব ও জুরির বিচারে, বিধুভূষণ চিরনির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

সরলাবালার গল্পটি কাঁচা রচনা। ১৩১০ সালে আরেকটি গল্প লিখে সরলাবালা কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথম বাঙালী মেয়ের রচিত প্রথম ডিটেকটিভ গল্প বলে এটির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে। সেই মূল্যের খাতিরেই গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। গল্পটির নাম 'ঘড়ি চুরি'।

(১)

সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, এ জন্য সকালবেলা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। শেখরবাবু তখন রাস্তার দিকের জানালার কাছে ইজি চেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন ; আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়া ছিলাম। তখন সবেমাত্র পেয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটি আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়াছিল।

ঘরখানি ইংরেজি ফ্যাসানের। ঘরের মেঝে মাদুর মোড়া, চেয়ার টেবিল কৌচে ঘরখানি পরিপূর্ণ, একপাশে একটি আলমারী, সেটি নূতন পুরাতন নানাবিধ পুস্তক সংবাদপত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই ঘরটি শেখরবাবুর বসিবার ঘর।

শেখরবাবুর পূর্ণ নাম সুধাংশুশেখর বসু। আমরা উভয় বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছি। একই বিদ্যালয় অধ্যায়ন করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত তাঁহাকে যেমন ভালবাসি এমন আর কাহাকেও বাসি কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এত দুর্বোধ যে, আমিও এতদিনেও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখন কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না কিন্তু সকলের সঙ্গেই অমায়িকভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন ও উপাধি অর্জ্জন করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর শেখরবাবু পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে কয়েক বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শেখরবাবু বইখানি রাখিয়া দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু আসছেন দেখছি। তুমি বোধহয় ওঁকে চেন।"

শেখরবাবু মধুর হাস্যের সহিত মহেন্দ্রবাবুর সংবর্দ্ধনা করিলেন তাহার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আজিকার সকালটা বড়ই বাদলা, খানিকটা চা আনিতে বলিব কি ?"

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটা বড় দরকারী কাজের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি বোধহয় জানেন যে আমি এখন পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের ডিটেকটিভ। এই ভদ্রলোকটি একটি ঘড়ি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেটি চুরি গিয়াছে, আজ পর্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

শেখরবাবু আগন্তুক ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বসুন মশায়, ব্যাপারটি কি ঘটিয়াছে সমস্তই আপনি বিস্তারিত করিয়া বলুন।"

"ব্যাপার এমন কিছু বিশেষ নয়। যেটি হারাইয়াছে সেটি একটি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঘড়ি ; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক ক্ষতির কথা এই যে, সেটি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। আপনি ঘড়িটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।" শেখরবাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ঘড়ি চুরি সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন ?"

"ঘড়িটী আমার দাদার নিকট থাকিত। সম্প্রতি দাদা রাজবাড়ী যাইবার সময় ঘড়িটী একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মেরামত করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার কাছে রাখিয়া যান। ঘড়ি মেরামত হইয়া গেলে আমি তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ফেরৎ ডাকে তাঁহার যে পত্র আসিল, তাহা পড়িয়াই আমি অবাক হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটি অল্পদামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি। এই দেখুন, তাঁহার পত্র।" বলিয়া ভদ্রলোকটি একখানি খামে ভরা পত্র শেখরবাবুর হাতে দিলেন।

শেখরবাবু খামখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আপনার দাদা বোধহয় রেলওয়ে অফিসে কাজ করেন ?"

"হ্যাঁ, তিনি রাজবাড়ীর স্টেশনমাস্টার। আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় আছে ?"

"না খামখানি দেখে এইরকমই অনুমান হচ্ছে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "খাম দেখে অনুমান হচ্ছে ?"

শেখরবাবু খামখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন না, খাম দেখে কিছু বুঝা যায় কিনা ?"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খামখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভায়োলেট কালীতে নাম ও ঠিকানা আর এখানকার ও রাজবাড়ীর পোষ্টমার্ক, ইহা ভিন্ন আর কোন চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কি কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।"

"পোষ্টমার্কটী ভাল করিয়া দেখিয়াছেন ?"

"হাঁ, পোষ্টমার্কে রাজবাড়ীর পর R.S. লেখা আছে বটে, কিন্তু অন্য লোকেও ত স্টেশনে চিঠি দিয়া যাইতে পারে।"

"চিঠিখানা কোন সময় সেখানে থেকে রওনা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছেন ?"

"ঠিক কথা, চিঠিখানা দেরিতে রওয়ানা হয়েছে, কিন্তু 'লেট ফির ছাপ নাই।"

শেখরবাবু বলিলেন, "এর থেকেই অনেকটা অনুমান হয় নাকি যে, যিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তিনি লেট ফি না দিয়েও চিঠিখানা পাঠাতে পারেন ?"

"তিনি স্টেশনের কর্ম্মচারী না হয় পোস্টাল কর্ম্মচারীও হতে পারেন।"

"ঠিক কথা। ভায়োলেট রংয়ের কালী সচরাচর কোথায় ব্যবহার হয় বলুন দেখি।"

মহেন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইয়া শেখরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন বলিলেন, "শেখরবাবু আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই কালী কপিং ইঙ্ক নামে রেলওয়ে স্টেশনে ব্যবহারের জন্য আজকাল চলিত হইয়াছে।"

শেখরবাবু বলিলেন, "রেলের স্টেশনে দরকারী কাগজপত্রের নকল রাখিবার জন্য যে কালির ব্যবহার, তাহা ডাকঘরে লইয়া গিয়া তাহাই পত্রে ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার।"

(২)

চিঠিখানি এতক্ষণ খামের মধ্যেই ছিল, এখন শেখরবাবু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্ব্বে একবার নাকে আঘ্রাণ লইলেন, তারপর কাগজখানি মহেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কাগজটা দেখে আপনার কি মনে হয় ?"

"বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফ সিট। কাগজখানি ছিঁড়িবার সময় বোধহয় তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেননা পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্ঠা ভায়োলেট কালীতে লেখা, অপর পৃষ্ঠায় কালো কালো দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধহয়, কোন একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।"

শেখরবাবু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "বেশ মহেন্দ্রবাবু, আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, যে চিঠির এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে সেই চিঠিখানি স্ত্রীলোকের কি পুরুষের ? আপনার কি বোধ হয় ?"

"চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখার যে দাগ পড়িয়াছে সেটা বাংলা লেখার ছাপ বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের চিঠি বলিয়া ঠিক করা অনেকটা কষ্টকল্পনা। পুরুষও তো বাংলাপত্র লিখিয়া থাকে।"

"নিশ্চয়ই লেখে কিন্তু চিঠিখানি যে পুরুষের লেখা নয় সে বিষয় কষ্ট কল্পনা ব্যতীতও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠিখানি একবার নাকের কাছে ধরুন দেখি।"

"বাঃ, চমৎকার গন্ধ।"

"গন্ধটি দেলখোসের গন্ধ। ডিকেটটিভ বিভাগে কাজ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধের পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক। দেলখোস প্রভৃতি যে সকল গন্ধ—দ্রব্যের সচরাচর ব্যবহার সে গুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। লিখিবার সময় কালী ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায়

ছাপ পড়িয়াছে। এরূপ অপরিষ্কার লেখাও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক সম্ভব। তাহার পর হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই লেখার এই উল্টো ছাপ দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি ইহা স্ত্রীলোকের লেখা।"

হরিভূষণ বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এই সাজের এখন আমার মনে হচ্ছে, বৌদিদি এইরকম সাজের কাগজ ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই চিঠির আধখানা কাগজে দাদা এই চিঠি লিখে থাকবেন। কিন্তু আপনার এই অদ্ভুত ক্ষমতা এই সমস্ত বৃথা বিষয় লইয়া অপব্যবহার হইতেছে। ইহাতে চুরির কোন সন্ধান হইতেছে না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "চুরির সম্বন্ধেও কতক সাহায্য হইল বই কি! এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি রাজবাড়ী স্টেশনে পার্শেল পৌঁছিয়াছে ও সেখানে আপনার দাদাও উপস্থিত ছিলেন, অতএব সেখান হইতে চুরি যাবার সম্ভাবনা খুব অল্প। আপনার ঘড়ি কিরূপে কাহাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন?"

হরিভূষণবাবু বলিলেন, "ঘড়িটী রেজিষ্ট্রী কি ইনসিওর করিয়া পাঠাই নাই, বেয়ারিং পার্শেল কখন খোওয়া যায় না জানিতাম, তাই বেয়ারিং পাঠাইয়াছিলাম। ঘড়ি আমি নিজে হাতে প্যাক করিয়া আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ঝির হাতে দিয়া পোষ্টাফিসে পাঠাইয়াছি। পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহা ঝির জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারপর ঘড়ির সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই।"

শেখরবাবু হরিভূষণবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাহার দাদার চিঠি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "আপনার দাদা লিখিয়াছেন চলন্ত ঘড়ি পাইয়াছিলেন, আপনি কি এখানে ঘড়িতে চাবি দিয়া দিয়াছিলেন?"

"হাঁ আমার মনে কেমন একটু খেয়াল হইয়াছিল যে এখান হইতে দম দিয়া পাঠাইলে ঘড়ি চলন্ত অবস্থায় পৌঁছায় অথবা কোন সময় বন্ধ হয় তাহা পরীক্ষা করিব, সেই জন্য আমি ঠিক দশটার সময় দম দিয়া দিই এবং দাদাকেও ঘড়ি চলিতেছে অথবা কয়টা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেখরবাবু, আপনি বোধহয় ঝির উপরেই সন্দেহ করিতেছেন, কিন্তু আমি ঝির ও তাহার আত্মীয়গণ কলিকাতায় যে যেখানে তাহাদের এমনভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি যে তাহারা চুরি করিলে নিশ্চয় ধরা পড়িত।"

হরিবাবু বলিলেন, "আমারও মনে হয় না যে বামা চুরি করিয়াছে। সে আমাদের অতি বিশ্বাসী ঝি। বিশেষতঃ পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহাই সে জানিত না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "অবশ্য আপনি কাহাকেও বলিয়া দেন নাই যে পার্শেলের ভিতর ঘড়ি পাঠাইতেছেন, কিন্তু পার্শেলের ভিতর একটা চলন্ত ঘড়ি পাঠাইলে যাহার হাতে পড়ে সে কি আর বুঝিতে পারে না?"

"ঘড়িটী প্যাক করার পর ওকথা আমার মনে হইয়াছিল, সেই জন্যে পাঠাইবার আগে কানের নিকট ধরিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম কিছুই শুনা যায় না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "ঘড়ির শব্দ অনেক সময় কানে শোনা অপেক্ষা স্পর্শের দ্বারা বেশী বুঝা যায়। আপনি যদি পার্শেলটা চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে কোন না কোন অবস্থায় শব্দ বুঝিতে পারিতেন। এই দেখুন, এই ঘড়িটীর উপর এই ছড়িখানি ছোঁয়াইয়া রাখিলাম অন্য দিকটা আপনি দাঁতে করিয়া ধরুন। শব্দ পাইতেছেন?"

হরিবাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তাহার পর দাঁতের ছড়িটী ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে আগে বলি নাই, ঘড়ির সঙ্গে আমি একটা থার্ম্মমিটারও পাঠাইয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে তো এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। থার্ম্মমিটারের খাপের একদিক ঘড়িতে ও অন্যদিক টিনের কৌটার গায়ে লাগিয়াছিল, সেই দিকে হয়তো হঠাৎ চোরের হাত পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই সে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই সব প্রমাণে বামার উপরেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু বামা ঘড়ি পাওয়ার ২৫ মিনিট পরেই পোষ্টাফিসে দিয়া আসিয়াছে এ খবর আমি ঠিক জানিতে পারিয়াছি। যদিও ঘড়ি ডাকে দিতে যাইবার সময় তাহার ভাইপোর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তথাপি তাহার দ্বারা এ কাজ হয় নাই সেই বিষয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তবে কাহার উপর সন্দেহ হয় ?"

"আমার অনেকটা এইরকম বিশ্বাস হইয়াছিল, আমার এখনও মনে হয় হরিবাবু পাঠাইবার সময় একটা গোলমাল করিয়াছেন।"

হরিবাবু ম্লানভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "আজকাল পুলিশে যাওয়া ভীষণ বিড়ম্বনা। যিনি অভিযোগ করিতে যাইবেন পাকে প্রকারে তাঁহাকেই অভিযুক্ত করা হইবে। মহেন্দ্রবাবু যেরূপ ভাবে আমাদের বাড়ি খানাতল্লাসি করিয়াছিলেন তাহাতে উনি যদি আমার বিশেষ বন্ধু না হইতেন তবে উহার সঙ্গে আমার বিষম মনোবিবাদ হইত।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাদের এই সব অসন্তোষকর কার্য্য করিতে হয়।"

"যে ঘড়িটী পাওয়া গিয়াছে সেটি কোথায় ?" হরিবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটী দাদা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন।"

"কবে পাঠাইয়াছেন ?"

"তিনি ঘড়ি পাইয়াই যখন দেখিলেন তাঁহার ঘড়ি নয়, তখন যে ট্রেনে তাঁহার চিঠি ফেলিয়াছিলেন সেই গাড়ীর গার্ডের হাতে আমার নিকট ফেরৎ দিবার জন্যে ঘড়িটী দিয়াছিলেন। গার্ড আমাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"পোষ্টাফিসে সন্ধান করে জানিতে পারিলেন ?" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "পোষ্টাফিস থেকে চুরি যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। পোষ্টমাষ্টার রাজকৃষ্ণবাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি ছটার সময় দার্জিলিং মেলে দিবার জন্যে পার্শেল রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলেন।"

শেখরবাবু বলিলেন, "তিনি ১২টার সময়েও তো ডাক রওনা করিয়া নির্দোষ হইতে পারিতেন।"

তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিদ্যভূষণ মহাশয়ের বড় ছেলের নাম রাজকৃষ্ণ নয় ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তিনি তো পোষ্টাফিসে কাজ করেন।"

শেখরবাবু ভাবিতে ভাবিতে ঘড়িটীর চারি দিকে মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে একটু চিন্তিতভাবে হরিবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটী পাইলেই আপনি বোধহয় সন্তুষ্ট হন। চোরকে ক্ষমা করিতে বোধহয় আপনার আপত্তি নাই। কারণ যে চুরি করিয়াছে তাহার বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহাকে জেলে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ

চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্যবোধ হইতেছে। চোর ধরা না পড়িলে ঘড়িটা কি করিয়া পাইবেন বুঝিতে পারিতেছি না, আর আপনি কোন অনুসন্ধান না করিয়া এ সমস্ত কি প্রকারে জানিবেন।"

শেখরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটাই চোরকে দেখাইয়া দিতেছে।"

মহেন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া ব্যগ্রভাবে ঘড়িটী হাতে লইলেন, খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

"ঘড়ির উপর কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে এবং ঘড়ির রিংয়ে একটু সূতা বাঁধা আছে দেখতে পাচ্ছি, চিহ্নের মধ্যে তো এই।"

শেখরবাবু বলিলেন, "উপরের দাগ কিছু নয়, ঘড়ির সঙ্গে এক পকেটে টাকা কি অন্যরকম পদার্থ ছিল দাগ দেখিয়া তাহাই বুঝা যায়। বরং ঘড়ির ভিতরে যেখানে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয় সেখানে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে ঘড়ির অধিকারীর মদের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। মাতালদের হাত কাঁপে বলিয়া চাবি দিবার সময় ঘড়িতে এইরূপ দাগ হয়। তবে রিংয়ের যে সূত্র আছে সেটিও একটি সূত্র বটে, কিন্তু সর্ব্ব প্রধান সূত্র এখনও আপনি ধরিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পোষ্টমাষ্টারবাবুকে কাল চারিটার সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঘড়ির সম্বন্ধে মীমাংসা করিব। আপনাদের কাহারও তাঁহার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।"

(৩)

পরদিন বেলা ৪টার সময় পোষ্টমাষ্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখরবাবুর সদাপ্রসন্ন মুখখানি আজ একটু বিমর্ষ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণবাবুকে বাড়ীর সংবাদ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পকেটে হাত দিয়া যেন আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায় গেল ?" তারপর রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটী দিন তো সময়টা দেখি।" রাজকৃষ্ণবাবু ঘড়িটী বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটী একটী কাল রং-এর কারে বাঁধা ছিল। শেখরবাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগনিফাইন গ্ল্যাস দিয়া কারের গিরা বাঁধা জোড়ার জায়গাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কলিকাতায় আসিয়া নূতন চাকরিতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। একথা নিশ্চয় জানিবেন যে পাপ কখনও লুকানো থাকে না। আমাদের কর্ত্তব্য আপনাকে রাজদ্বারে সমর্পণ করা, কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণবাবুর ঘড়িটী অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দিবেন।"

পোষ্টমাষ্টার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, একটু পরে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কেন যে এরূপ বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

শেখরবাবু বলিলেন,"আমি বুঝাইয়া দিতেছি। এই ঘড়িতে যে রেশমটুকু বাঁধা আছে সেটা ওই কারের, আর ঘড়ি পাঠাইবার সময় তাড়াতাড়িতে আপনি খুলিতে না পারিয়া কারটা কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর দেখুন, ফণিবাবু যে ঘড়ি পাইয়াছেন সেটী তখন

চলিতেছিল, চলন্ত অবস্থাতেই তিনি ফেরৎ পাঠান, এখানে থামিয়া একটা বাজিয়া ঘড়িটী বন্ধ হয়। কাল আমি ঘড়িটীতে চাবি দিয়া দেখিয়াছি ঘড়িটী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় রাখে। অতএব একটার সময় ঘড়িতে চাবি দেওয়া হইয়াছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন পোষ্টাফিসের খাতাপত্রেও প্রকাশ এবং আপনিও স্বীকার করেছেন ঘড়ি দুটো পর্যন্ত আপনার কাছেই ছিল, তাহার পর তাহা মেলে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি একটার সময় চাবি দিয়া ঘড়িটী প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রমাণ যে-কোন অদালতে আপনাকে দোষী করিবে তাহা বোধহয় এখন বুঝিয়াছেন।"

(৪)

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্রবাবু ও হরিবাবু উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "শেখরবাবু, ব্যাপার কি ? সেই অল্পবয়স্ক চোর ও চোরাই ঘড়ির কোন সন্ধান পাইয়াছেন নাকি ?"

শেখরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চোরটির সন্ধান আপাতত দিতে পরিতেছি না, ঘড়িটীর সন্ধান পকেটেই আছে"—বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া দিলেন।

শরচ্চন্দ্র সরকারের অনুসরণ করে এবং তাঁরই কোনো কোনো বই পুনরায় প্রকাশ করে পাঁচকড়ি দে অবতীর্ণ হলেন বাংলা ডিটেকটিভ সাহিত্যের বিখ্যাততম লেখকরূপে। পাঁচকড়ির প্রথম রচনা 'সতী শোভনা' নিতান্ত চটি বই। কাহিনী মন্দ নয় তবে মূল নিশ্চয়ই বিদেশী। বইটি ছিল সচিত্র। (তাঁর পরের বইগুলি ছাপা বাঁধাই ও ছবি আর কাহিনী নিয়ে পাঠকদের মাতিয়ে তুলেছিল)। অন্যের লেখা বইও তিনি সম্পাদক ও সংকলকরূপে প্রকাশ করেছিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল, পরে তা তুলে দেওয়া হয়। পাঁচকড়ির এক প্রধান লেখক বা 'গোস্ট লেখক' ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল। ইনিই বোধ হয় বইগুলির মূল প্রকাশক পাল ব্রাদার্সের একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পাঁচকড়ি দে'র কৃতিত্বের কতখানি ধীরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য তা সম্পূর্ণ নির্ণয় করা যায়নি। মনে হয় অনেকখানিই প্রাপ্য। পাঁচকড়ি দে'র 'প্রণীত' এবং 'সঙ্কলিত' বইয়ের উল্লেখ করছি—'মায়াবিনী', 'মনোরমা', 'মায়াবী', 'জীবন্মৃত রহস্য', 'নীলবসনা সুন্দরী' (২য় সংস্করণ ১৯০৭), 'পরিমল', 'কালসর্পী', 'প্রতিজ্ঞাপালন', 'বিষমবৈসূচন', 'ভীষণ প্রতিহিংসা', 'রহস্যবিপ্লব', 'লক্ষ টাকা' ইত্যাদি।

এক হিসাবে পাঁচকড়ি দে বাঙালী ডিটেকটিভ কাহিনী লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য যেহেতু ইনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম দুটি ডিটেকটিভকে সৃষ্টি করেছেন (যদিও ইংরেজীর অনুসরণে)।তাছাড়া প্রিয়নাথ ও শরচ্চন্দ্র রোপিত ক্রাইম কাহিনীর চারাগাছকে তিনি রসালে পরিণত করেছিলেন। এঁরা হলেন 'দেবেন্দ্রবিজয়' আর তাঁর সহায়ক ও গুরু 'অরিন্দম'।

এখন পাঁচকড়িবাবুর স্ব-রচিত বইগুলির আলোচনা করি। 'পরিমল' বইটির কাহিনীতে যথেষ্ট রোমহর্ষক উপাদান আছে। কাহিনীতে যিনি ডিটেকটিভ তাঁর নাম সঞ্জীবচন্দ্র। এটি লেখকের প্রথম রচনা হতে পারে।

'সতী শোভনা' অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ২০ পৃষ্ঠা। ছোটগল্পের মতো, শব্দ সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি নয়। তবুও 'উপন্যাস'। একটি ছবি আছে, লাইন ব্লক। পাঁচ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রকাশকের নাম নেই। কলকাতা বসাক প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৯৯। মূল্য চার আনা।

'সতী শোভনা'র গল্পটি ভালো। বস্তু হয় ইংরেজী থেকে নেওয়া, নয় রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' পড়ে। পরিকল্পিত কাহিনীটুকু বলছি। এক যুবক তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসেন। স্ত্রীও তাঁকে ভালোবাসেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর স্ত্রী একটি ছোট হাত বাক্স খুব সন্তর্পণে রক্ষা করেন। তার ভিতরে কি আছে কাউকেও তা দেখতে দেন না, এমন কি স্বামীকেও নয়। স্বামীর কৌতূহল বেড়েই চলল। একদা সুযোগ পেয়ে তিনি সেই বাক্স খুললেন। দেখেন একতাড়া প্রেমপত্র সযত্নে রক্ষিত। পত্রে কারো নাম নেই, না প্রেরক পুরুষের, না প্রাপক নারীর। চিঠিগুলি পড়ে যুবকের মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি নিশ্চয় করলেন যে, তাঁর পত্নী অন্যাসক্তা। বুকে ছুরি বসিয়ে তিনি পত্নীকে হত্যা করলেন। এক ফোঁটা রক্ত এসে তাঁর হাতে পড়ল।

দিন কতক পরে তাঁর পত্নীর বিধবা বাল্যসখী এসে বললেন যে সইয়ের কাছে তাঁর কতকগুলি চিঠি রাখতে দেওয়া ছিল সেগুলি ফেরত চাই। কীসের চিঠি জানতে চাইলে মেয়েটি বললে, সে আমার ব্যক্তিগত গোপন চিঠি, তাকে রাখতে দিয়েছিলুম। যুবক চিঠিগুলি ফেরত দিলেন।

তার পরে অনুতাপের পালা। কিন্তু সেই সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণাও দেখা দিলে। হাতে যেখানে পত্নীর রক্তবিন্দু পড়েছিল সে স্থানে অসহ্য রকম জ্বালা করতে লাগল। থাকতে না পেরে সে স্থানে অস্ত্রোপচার করালেন। এইভাবে বারবার অস্ত্রোপচার করাতে করাতে শেষে দেয়ালে মাথা ঠুকে যুবক আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়ালেন।

ডিটেকটিভ কাহিনী নয় তবে ক্রাইম স্টোরি বটে।

'দারোগার দপ্তর' ও 'গোয়েন্দাকাহিনী' নাম দুটির খিচুড়ি করে 'গোয়েন্দার গ্রেপ্তার' নামে একটি সিরিজ বেরোতে থাকে। বেরোত পুস্তিকাকারে নয়, ফর্মা হিসাবে। এই পত্রিকায় পাঁচকড়িবাবুর 'জুমেলিয়া' উপন্যাসটির তিনচার ফর্মা বেরিয়েছিল। তারপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এ হল ১৩০৪ সালের কথা। তারপর ১৮৯৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে সম্পূর্ণ বইটি 'মায়াবিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির বেশ সমাদর হয়েছিল কেননা বছর খানেক পরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

'মায়াবিনী'তে প্রথম দেখা দিলেন পাঁচকড়িবাবুর সৃষ্ট অন্যতম উজ্জ্বল ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয়বাবু। ইনি 'মনোরমা' বইটির কাহিনীতেও অবতীর্ণ হয়েছেন। এ গ্রন্থের কাহিনী কামরূপ কামাখ্যার যোগিনীদের তান্ত্রিক কাণ্ড নিয়ে। তান্ত্রিকতার ও থিয়োসফির (মেসমেরিজমের) সমন্বয়।

অতঃপর দে-মহাশয়ের তিনখানি বৃহত্তম উপন্যাস পর পর বার হয়। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হল তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মায়াবী'। বইটি যেন 'মায়াবিনী'র অনুবৃত্তি। ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয়ের সঙ্গে দেখা দিলেন তাঁর ডিটেকটিভ-গুরু অরিন্দমবাবু। ফুল সাহেবের দৌরাত্ম্যে কাহিনী জমজমাট, যেমন ছিল জুমেলিয়ার দৌরাত্ম্যে মায়াবিনীর কাহিনী।

১৯০৩ সালে প্রকাশিত হল 'জীবন্মৃত রহস্য'। লেখকের মতে 'হিপনটিক উপন্যাস'। এতে যেন একরকমভাবে 'মনোরমা'র জের টানা হয়েছে। তবে এতে হিপনটিজম্ ইত্যাদি পাশ্চাত্য Occult মশলা বেশি নেই। ডিটেকটিভের স্থান নিয়েছেন ডাক্তার বেন্টউড। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। ১৩৪০ সালে পঞ্চম সংস্করণে বইটির নাম পাল্টে রাখা হয় 'সেলিনাসুন্দরী'। নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন অনুসারে—

'এবার জীবন্মৃত-রহস্য উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করিয়া 'সেলিনাসুন্দরী' নামকরণ হইল।

তাহার কারণ—কেহ কেহ 'জীবন্মৃত-রহস্য' নাম শুনিয়া মনে করেন, ইহাতে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে এবং ভূত-প্রেতেরও অসদ্‌ভাব হইবে না ; সুতরাং এই ভয়ে পুস্তক হস্তস্থ করিতে সাহস করেন না।

দেখিলাম, এক্ষেত্রে নামের পরিবর্তন সমীচীন।'

'নীলবসনা সুন্দরী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে। নামটি নেওয়া দামোদর মুখুজ্জের 'শুক্লবসনা সুন্দরী'র আদর্শে (ও নামটিও আবার নেওয়া ইংরেজী থেকে)। ডিটেকটিভ সেই অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়।

সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি আলাদা ডিটেকটিভ মিলছে। 'রহস্য-বিপ্লব' কাহিনীর ডিটেকটিভ কীর্তিচন্দ্র। এঁর নিবাস ছিল বোম্বে। এঁর সহায়ক ছিলেন এঁর ভায়েরা দাদা ভাস্কর ও ছোট ভাই লালু।

'ছদ্মবেশী'র কাহিনীতেও কীর্তিচন্দ্র ডিটেকটিভ। 'শোণিততর্পণ' কাহিনীর ডিটেকটিভ রামপাল।

'গোবিন্দরাম', 'মৃত্যু বিভীষিকা', 'প্রতিজ্ঞাপালন' ও 'সতী সীমন্তিনী' এই চারখানি বইয়ে গোয়েন্দা হলেন গোবিন্দরাম। এই ডিটেকটিভের নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তি দেওয়ান গোবিন্দরামের প্রভাব থাকা সম্ভব। 'গোবিন্দরাম' বইটি মায়াবিনী-মায়াবী-নীলবসনা সুন্দরী এই ত্রয়ীর মতোই আকারে বড়ো এবং সুখপাঠ্য। এ চরিত্রটির গঠনেও কৃতিত্ব আছে। 'ছদ্মবেশী' থেকে 'গোবিন্দরাম' পর্যন্ত বইগুলির কাহিনী ইংরেজী থেকে নেওয়া। সম্ভবত এ বইগুলির রচয়িতা ধীরেন্দ্রনাথ পাল।

পাঁচকড়ি দে'র নামে প্রকাশিত 'হরতলের নওলা' কোনান ডয়েলের 'দি সাইন অফ ফোর' (১৮৯০) বইটির অনুবাদ। শার্লক হোম্‌সের গল্পের অনুবাদ বাংলায় এই প্রথম।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, সাহিত্যিকদের মধ্যে ডিটেকটিভ কাহিনী লিখতে গিয়ে এসেছিলেন সর্বপ্রথম অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৯-১৯১৫)। এঁর নিবাস ছিল হুগলী জেলায় দামোদরের তীরে ভাঙামোড়া গ্রামে। ইনি গোতান গ্রামের মাইনর স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছিলেন এবং বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে কিছু ভাল গবেষণাও করেছিলেন। ইনি প্রথমে সাধারণ গল্প উপন্যাস লিখতেন, সেগুলির অধিকাংশই বটতলা প্রেসে ছাপা হয়েছিল। তবুও সেগুলি বটতলার বই মনে করে উপেক্ষিত হয়নি। শেষের দিকে ইনি বোধকরি সাংসারিক প্রয়োজনের দায়ে পড়ে কিছু গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছিলেন। এগুলি বটতলার বই মনে করে উপেক্ষিত হয়েছে। তবে বটতলার সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনীর তুলনায় অনেক ভাল।

আম্বিকাচরণ একটি ডিটেকটিভ পত্রিকা বার করেছিলেন,নাম 'গোয়েন্দার গল্প'(১৩১৫)। এতে তাঁর একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস বার হয়েছিল, নাম 'স্বর্ণবাঈ'। এতে একটি রঙীন ছবিও ছিল। পত্রিকাটি কতদিন চলেছিল জানি না।

অম্বিকাচরণের গল্পকাহিনীগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল' (১৮৯৯)। বইটির কাহিনী ছদ্ম ঐতিহাসিক, ক্রাইমঘটিত। সম্ভবত বিদেশী বইয়ের ছায়া অবলম্বনে লেখা। বইটির বিশেষত্ব হল যে এর মধ্যে কোনো বর্ণনা নেই, আগাগোড়া চিঠি ও দলিল গাঁথা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন—

'এদেশে ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঙলা ভাষায় বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল, কেবলমাত্র ছন্দোবন্ধে গ্রথিত কাব্য ভিন্ন ভাষায় আর কিছুই ছিল না··· । পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণে বাঙ্গালা ভাষার শ্রী ফিরিয়াছে, ঐশ্বর্য বাড়িয়াছে, গদ্য, কাব্য, নাটক, নভেল, প্রহসনাদিতে বাঙ্গালা ভাষার পুরপুষ্টি জন্মিতেছে। নানারকমের ভালমন্দ অনেক জিনিস বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। 'পুরাণ কাগজ' তাহাদের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিল মাত্র। এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যায়।···'

পুস্তিকাটি পুর্নমুদ্রিত হওয়ার যোগ্য।

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) অম্বিকারচরণ গুপ্তের মতোই শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষকতা করবার সময় তিনি ক্রাইম-অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা গল্পকাহিনী লিখতে শুরু করেন, এবং তাঁর এই বইগুলি প্রকাশিত হয় : 'বাসন্তী' (১৮৯৮), 'হামিদা' (১৮৯৯), 'পট' (১৯০১), 'জয়সিংহের কুঠী' (১৯০২) ও 'আমিনা বাঈ' (১৯০২)। ১৩০৬ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পুস্তিকায় তাঁর প্রথম ডিটেকটিভ গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি অনুবাদ নয়, মৌলিক। চিত্তাকর্ষক না হলেও মন্দ নয়। গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার গ্রামের ছবি নিয়ে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এই পরিচ্ছন্ন রচনাগুলি 'পল্লীচিত্র' (১৯০৪), 'পল্লীবৈচিত্র্য' (১৯০৫) ইত্যাদি নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে দীনেন্দ্রকুমারের নাম লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইস্কুলে পড়ানো ছেড়ে দিয়ে দীনেন্দ্রকুমার কিছুদিনের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের (তখনকার অরবিন্দ ঘোষের) বাংলার শিক্ষক হয়ে তাঁর সঙ্গে বরোদায় অবস্থান করেন। তারপর কলকাতায় এসে বটতলা অঞ্চলের প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঁধা লেখক হন। ১৩০৮ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নন্দন কানন' নামে একটি ক্রাইম কাহিনী, উদ্ভট গল্প ইত্যাদি বিষয়ের মাসিক পত্রিকা ছাপাতে শুরু করেন। দীনেন্দ্রকুমার এই পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রথম বৎসর ঠিক মাসিক পত্রিকার মতোই মাসিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় দীনেন্দ্রকুমারের দীর্ঘ ক্রাইম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল—অজয়সিংহের কুঠী, বইটি ইংরেজী বইয়ের রূপান্তর। দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৯) থেকে 'নন্দন-কানন' মাসিক পত্রিকার বদলে মাসিক ক্রাইম গ্রন্থ সিরিজে পরিণত হয়। এ সিরিজের কোনো বইয়ের গ্রন্থকারের নাম থাকত না।

নন্দন-কানন সিরিজ ছাড়াও বেনামীতে দীনেন্দ্রকুমারের হুনুরি উপন্যাস বার হয়েছিল। এই ধরনের আরও কিছু ইংরেজী রহস্য-কাহিনীর অনুবাদ করে দীনেন্দ্রকুমার যশোবৃদ্ধি করেছিলেন। এই ধরনের রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হল রাইডার হ্যাগার্ডের 'আয়েষা' ও 'শী' বইদুটির অনুবাদ ; 'রূপসী মরুবাসিনী' (প্রথম খণ্ড ১৩১৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১৭), 'মহিমময়ী' ক্যাপ্টেন ম্যারিয়টের 'দি ফ্লাইং ডাচ্‌ম্যান'-এর অনুবাদ 'ভূতের জাহাজ' এবং জে এস ফ্লেচারের (?) দুটি গ্রন্থের অনুবাদ 'পিশাচ পুরোহিত', 'জাল মোহান্ত' ও 'চীনের ড্রাগন' (১৯১৪)। এইরকম আরেকটি বই (তাঁর লেখা কিনা ঠিক জানা নেই) 'নিহিলিষ্ট রহস্য'ও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

১৩০৯ সাল থেকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নন্দন-কানন সিরিজ' নামে একটি মাসে মাসে প্রকাশিত ক্রাইম কাহিনী গ্রন্থমালার প্রকাশ শুরু করেছিলেন, সে বইগুলি আকারে ছোট নয় ; ছাপা কাগজ ভালো, দু'একটা ছবিও থাকত। মূল্য আট আনা করে। যতদূর জানি এই

সিরিজে এই বইগুলি বার হয়েছিল—'কালরাত্রি' 'রূপসী কলঙ্কিনী', 'ছায়া গোয়েন্দা', 'রহস্য যবনিকা', 'তস্কর রহস্য', 'জাপান রহস্য', 'ভণ্ড পাদরী', 'তিন তাড়া', 'গৈবি খুন', 'মেয়ে বোম্বেটে', 'সোনার খনি', 'যখের ধন'। বলাবাহুল্য বইগুলি সবই ইংরেজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

'নন্দন-কানন' সিরিজের যে বিজ্ঞাপন বার হত তা বেশ কৌতুকাবহ। এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দিন দিন যে নব নব ভাব, নব নব প্রতিভা, নব নব বুদ্ধিচাতুর্যের প্রভাব সাহিত্য-জগতে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ভাব, সেই প্রতিভা, সেই অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের সুন্দর সুন্দর প্রেমের উপন্যাস অত্যদ্ভুত কৌশলপূর্ণ হৃদয়স্তম্ভনকারী ডিটেকটিভ উপন্যাস এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাবিধ ভৌগোলিক দৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ, বিস্ময়কর উপন্যাস এই নন্দন-কানন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি মাসের প্রত্যেক পুস্তক নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন ঢঙ্গ, নূতন নূতন রহস্যমালা, নূতন নূতন সুরঞ্জিত চিত্রাবলী পরিশোভিত প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুস্তকই ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, দৃশ্যসমন্বিত নানা দেশের প্রেমের, বিরহের ২/৩খানি তিন রংয়ের হাফটোন চিত্রসম্বলিত।

যে সমস্ত সুলেখকগণের লিপিকৌশলে প্রত্যেক বঙ্গবাসী মুগ্ধ সেই সকল প্রথিতনামা লেখকগণ আমাদের নন্দন-কাননের নিয়মিত লেখক।

যাহাতে বঙ্গের প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকা আবার কুরুচিপূর্ণ বটতলার অপাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া, শিক্ষাপূর্ণ এই নন্দন-কানন-রত্নমালিকা গৃহে গৃহে রাখিতে পারেন, সেই জন্য আমরা ইহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ (ছয়) টাকা ধার্য করিয়াছি, তাহাও আমরা অগ্রিম চাহি না। আমরা প্রতি মাসে পুস্তক পাঠাইয়া কেলবমাত্র আট আনা লইব। প্যাকিং, ভিঃ পিঃ কিছুই গ্রাহককে দিতে হইবে না। কেবল একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক ধনী, প্রত্যেক গৃহস্থ, নিজ নিজ পরিবারস্থ মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে নানাবিধভাবে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সুলভের সুলভ সচিত্র নন্দন-কানন-সিরিজ প্রতি মাসে আট আনায় লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ, আবরণ যতদূর সম্ভব বিলাতীর ন্যায় মনোহর।'

নন্দন-কানন সিরিজের বইগুলিতে লেখক অর্থাৎ অনুবাদকের নাম থাকত না। নামপৃষ্ঠায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এমনভাবে থাকত যাতে বোধ হয় তিনিই যেন লেখক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কারবারের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের সম্পর্ক ছেদ হয়। তিনি নিজেই 'রহস্যলহরী' সিরিজ নামে হালকা ডিটেকটিভ পুস্তিকাবলী বার করতে থাকেন।(ইংরেজী Sexton Blake সিরিজের এই অনুবাদগুলি সবই কিশোর পাঠ্য। ইংরাজীতে যাকে বলে জুভেনাইল গল্প, সেই জাতীয় লঘু ইংরেজী কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।) সব বইয়েই ডিটেকটিভ মিস্টার ব্লেক ও তাঁর সহকারী স্মিথ। বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী' সিরিজের এই বইগুলি। পুস্তিকাগুলি সংখ্যায় দুশোরও বেশি ছিল। শেষের দিকে তিনি দেশে গিয়ে নদীয়া জেলায় মেহেরপুরের কাছে অনন্তপুরে একটি প্রেস খোলেন। পরে সেখান থেকে রহস্যলহরী পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

'রহস্যলহরী' সিরিজের বইগুলি রচনায় দীনেন্দ্রকুমার তাঁর মূল (ইংরেজী) ঢাকা দেবার চেষ্টা তো করেননিই উপরন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ইংরেজী বাক্য ও বাক্যাংশ ইংরেজী অক্ষরে ব্র্যাকেটে সন্নিবেশিত করেছেন। ইংরেজী মূলের আভাস জাগিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য ছিল ইস্কুলের ছাত্রের কাছে বইগুলি আরো লোভনীয় করা (তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজী ও বাংলা প্রশ্নপত্রে অনেক নম্বর থাকত ইংরেজী থেকে বাংলায় ও বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদে।)

ইতিহাস অনুরাগী লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) ভারতী, সাধনা ইত্যাদি পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গল্প লিখে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। মোগল বাদশাহদের বিষয়ে এঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের বশে তির্যকভাবে রেনল্ডস ও ভুবনচন্দ্রের অনুসরণ করে তিনি ক্রাইম কাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস রচনাতেও ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন (বলা বাহুল্য এঁর ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলি সবই বিদেশী মূল অবলম্বনে রচিত।) মোগল অন্তঃপুরের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে তাঁর গল্পগুচ্ছের প্রথম সংকলন হল 'রঙ্গমহাল' (১৯০১)। এই সচিত্র ও সুপরিচ্ছন্ন ছাপা বাঁধাই বইটির খুব সমাদর হয়েছিল। এই ধরনের তাঁর অপর বই হল 'শীশমহল' (১৯১২), 'নূরমহল' (১৯১৩), 'মতিমহল' (১৯১৭) ইত্যাদি। হরিসাধনের ডিটেকটিভ রচনা হল—'কঙ্কণ-চোর' (১৯১৬), 'লালচিঠি' (১৯১৬), 'মৃত্যু-প্রহেলিকা' (১৯১৭), 'শয়তানের দান' (১৯১৯), 'পান্নার প্রতিশোধ' (১৯১৯) ইত্যাদি।
'মৃত্যু-প্রহেলিকা' বইটি ডিক ডনোভানের একটি উপন্যাসের অনুবাদ।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, কুন্তলবৃষ্য এই তিনটি কেশতৈলের প্রস্তুতকারক কলকাতার কবিরাজমহল কুন্তলীন পুরস্কারের অনুসরণে বছর বছর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পুস্তিকা বার করতেন। উদ্দেশ্য নিজেদের প্রস্তুত কেশতৈল ও অন্যান্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে কেশতৈল ও ঔষধ সেবনকারীদের প্রচুর প্রশংসাপত্র থাকত। পুস্তিকাটিকে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য করবার জন্য থাকত দিনপঞ্জী অথবা ডায়েরি এবং/অথবা গীতসংগ্রহ, গল্প, উপন্যাস। গল্প উপন্যাসের মধ্যে ডিটেকটিভ কাহিনীও বাদ পড়ত না। এই পুস্তিকাগুলিতে প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস, সাধারণ অথবা ডিটেকটিভ, প্রায় সবই পাকা লেখকের রচনা, তবে লেখকের নাম থাকত না। (মনে পড়ছে এইরকম একটি পুস্তিকায় আমি একটি ডিটেকটিভ কাহিনী পড়েছিলুম 'হত্যাকারী কে ?' নামে। কাহিনীটি পাঁচকড়ি দে'র ওই নামের ডিটেকটিভ উপন্যাস থেকে অনেক ভালো। কাহিনীতে ডিটেকটিভের নাম মিঃ মিত্র,অবশ্যই কাহিনীর মূল বিদেশী।) হরিসাধনবাবু এইসব কবিরাজী পুস্তিকায় বেশ কিছু ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন।

হরিসাধনের 'রঙ্গমহাল'-এর অনুসরণে বটতলার পাবলিশার বিনোদবিহারী শীল বার করেছিলেন একটি বড় বই, নাম 'বেগম মহল'। রচয়িতার নাম দেওয়া নেই। প্রকাশক বটতলার হলেও বইটিকে বটতলার বলা চলে না। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই বেশ উত্তম, তবে ছবি ছিল না। আখ্যানগুলি বেশ সুপাঠ্য।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক এক পণ্ডিত লেখক, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শাস্ত্রঘটিত এবং ক্রাইমঘটিত দুই ধরনের গ্রন্থ রচনা করে বটতলা এবং অ-বটতলা দুই শ্রেণীর প্রকাশকদেরই প্রশ্রয় লাভ করেছিলেন। সুরেন্দ্রমোহনের কোনো কোনো সাধারণ উপন্যাস, ক্রাইম কাহিনী ও ডিটেকটিভ উপন্যাস বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন, 'লোহার বাঁধন', 'সোনার কণ্ঠী' (১৯১০ দ্বি সং ১৩১৭,) বইটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে) 'মিলনমন্দির', 'লাল পল্টন' ইত্যাদি। আর বই হল 'দুই দারোগা', (৪র্থ সংস্করণ ১৩২৭), 'নকল রাণী', 'ধড়িবাজ চোর', 'ভৈরবী' ইত্যাদি। ইনি কিছু ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন।

পাঁচকড়ি দে'র অনেক গ্রন্থের প্রকাশক পাল ব্রাদার্স ১৯০৯ খৃস্টাব্দে একটি গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন উপন্যাস-সংগ্রহ নামে। সম্পাদক অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল। মনে হয় এ নামটি পাঁচকড়ি দে'র অথবা অন্য কারো ছদ্মনাম। আমার অনুমানের কারণ হল দুটি—(এক) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল নামে কোনো লেখকের বা সম্পাদকের অথবা প্রকাশকের নাম অন্যত্র আমার অভিজ্ঞতায় মেলেনি। (দুই) নামটির আগে 'শ্রী'ও নেই এবং (ঁ) চিহ্নও নেই।[(ঁ) চিহ্ন এই বইটিতে পাই শরচ্চন্দ্র সরকারের নামের আগে, কারণ তখন তিনি স্বর্গত।] বইটি অভিনব এই অর্থে যে একাধিক লেখকের গল্পের কোনো সংগ্রহ এর আগে আর বাংলায় পাওয়া যায়নি। এ সম্বন্ধে প্রকাশক ভূমিকায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

> 'বঙ্গসাহিত্যে ইহা এক নূতন উদ্যম। পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে অনেকবার এক-একজন লেখকের ছোট ছোট গল্প একত্র করিয়া বিভিন্ন নামে এক-একখানি উপন্যাস-সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ক্ষুদ্র উপন্যাস একত্র করিয়া কোনো পুস্তক অদ্যাপি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই।'

উপন্যাস-সংগ্রহ বইটিতে বারোটি ক্ষুদ্র উপন্যাস অর্থাৎ গল্প আছে। গল্পগুলি নানা জাতের—ঐতিহাসিক, সামাজিক, অলৌকিক এবং ডিটেকটিভ। লেখক হলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল (একটি), শরচ্চন্দ্র সরকার (পাঁচটি), শ্রীপাঁচকড়ি দে (চারটি) ও শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (দুটি)। পাঁচকড়ি দে'র একটি গল্প (অনুবাদ) ডিটেকটিভ এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি গল্পও ডিটেকটিভ (ইংরেজী থেকে গল্পের বস্তু নেওয়া সম্ভব)। হেমেন্দ্রকুমারের গল্পটির নাম 'হীরার কণ্ঠী'। যতদূর জানি এই গল্পটি হেমেন্দ্রকুমারের লেখা প্রথম ডিটেকটিভ কাহিনী। গল্পটিতে কাঁচা হাতের পরিচয় আছে, তবে স্টাইল মন্দ নয়। গল্পটির গোড়া থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

> 'রাওয়ালপিণ্ডির 'জাতীয় ভাণ্ডার' নামক হীরকজহরতের কারবার সুপ্রসিদ্ধ মারকেটের সন্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ময়দানের উপরে বিরাজিত ছিল। এবং তাহার প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত সৌধ পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।
>
> কারবারের দুইজন প্রাচীন অংশীদার বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কারবার হইতে আপনাদের অংশ তুলিয়া লয়েন নাই। একজনের নাম রাম সিংহ, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় নবতি বর্ষ হইবে। তিনি রকটোবী পাহাড়ের কাছে বাস করেন। দ্বিতীয় অংশীদারের নাম সুজন সিংহ, বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। বাতে পঙ্গু হইয়া পড়াতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুজন সিংহ পে অফিস লেনে বাস করেন।
>
> কারবারে আরও অনেক অংশীদার আছেন। তন্মধ্যে অজিত সিংহই সকলের

অপেক্ষা উদ্যোগী। তাঁহার মিষ্ট ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মোহিত হইয়া অনেক ক্রেতা অপর কোন স্থান হইতে জিনিস না কিনিয়া জাতীয় ভাণ্ডার হইতেই ক্রয় করিতেন। অজিত সিংহ দেখিতেও অতি সুপুরুষ। গৌরবর্ণ, বড় বড় চক্ষু চশমাশোভিত, সুগঠিত নাসা, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন।'

ছাপার ও লেখার কালি প্রস্তুতকারী কারখানার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীমোহন বাক্‌চির পুত্র কিশোরীমোহন (১২৭৫-১৩৩০) ১৯০৮-১৯০৯ সালের দিকে জ্যোতিষ, তন্ত্র, সাধারণ শাস্ত্র ও গল্প উপন্যাসের বই প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পি· এম· বাক্‌চি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন কার্য শুরু হয়েছিল অল্পদিন আগে পঞ্জিকা প্রকাশনের দ্বারা। এঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ক্রাইমকাহিনী এবং ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসও ছিল। এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম বই বোধ করি কিশোরীমোহনের 'অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড'। সচিত্র বইটির একাধিক সংস্করণ থেকে বোঝা যায় যে এটি পাঠকের কিছু সমাদর লাভ করেছিল। এঁদের প্রকাশিত ক্রাইম ও ডিটেকটিভ আখ্যায়িকা লেখকদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রমোহন ও হরিসাধনের কথা আগে বলেছি। নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি বই লিখেছিলেন যেমন, 'জয়মাল্য', 'ললিতাকুসুম', 'নবীন গোয়েন্দা', 'নারীর বল', 'রূপের নেশা' ও 'সৎ-মা'। ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'অল্পবুদ্ধি', 'চোর ও ডিটেকটিভ' ও 'তিন বন্ধু'। 'চোর ও ডিটেকটিভ' বইটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল। বইটি মরিস লব্লাঁর কয়েকটি গল্পের রূপান্তর।

চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে, ঠিক করে বললে ১৯৩২ সালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় ও প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাংলা ডিটেকটিভ কাহিনীর ইতিহাসের পাতা উলটে দিলেন। তিনি ভূত-অপরাধ-গোয়েন্দগিরি নিয়ে, ইংরেজী করে বললে মিস্টরি ক্রাইম ডিটেকশন নিয়ে, একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করলেন 'রোমাঞ্চ' নামে। বিলেতের পক্ষে এ ব্যাপার অভিনব নয়। তবে আমাদের দেশের বাংলা ও ভারতবর্ষের পক্ষে অভিনব বটে। পত্রিকাটি এখনও চলছে মাসিকরূপে। এবং কি ব্রিটেনে কি আমেরিকায় এত দীর্ঘজীবী আর কোনো রহস্য রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা পত্রিকা নেই। (বাংলা দেশে অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অগ্রজ ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত। কিন্তু এঁদের পত্রিকা ছিল মাসিক এবং বছর খানেকের বেশি কোনোটিই চলেনি।)

সাপ্তাহিক 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে ক্রাইম-ডিটেকটিভ গোয়েন্দা গল্প থাকত। মূল্য এক আনা। প্রথম দুই সংখ্যার গল্প দুটি প্রণব রায়ের লেখা। এঁর দুটি গল্পের ডিটেকটিভের নাম প্রতুল লাহিড়ী। অতঃপর পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সকল ডিটেকটিভ গল্পেই, যাঁর লেখা হোক না কেন, ডিটেকটিভ ছিল প্রতুল লাহিড়ী। প্রণব রায় 'রোমাঞ্চ' পত্রিকাটিতে অনেক ডিটেকটিভ গল্প-কাহিনী লিখেছিলেন। অপর লেখকদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, মণি বর্ধন, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। রোমাঞ্চের লেখকদের উপজীব্য ছিল এডগার ওয়ালেস। মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিজেও বহু ক্রাইম ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন, তবে দু একটি ছাড়া তাঁর সব গল্পই অন্যের নামে ছাপা হয়েছিল। অন্য বলতে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি। (এর কারণ বোঝা

দুরূহ নয়। একই লেখকের ক্রমাগত গল্প বার হলে গ্রাহক-পাঠকেরা ক্লান্তিবোধ করতে পারে। সেই কারণে গ্রাহক-পাঠকদের কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যেই সত্বাধিকারী-সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বহুনামী হয়েছিলেন।)

॥ ৪ ॥

পালাবদল

বাংলায় গোয়েন্দা-কাহিনীর ধারার মোড় ফিরল শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আরম্ভ থেকে। এখন থেকে গোয়েন্দা-কাহিনী হল পুরোপুরি কৈশোরক রচনা। শুরু হল কোনান ডয়েলের গল্প নিয়ে। ছেলেদের জন্যে বিদেশী কাহিনী লিখে কুলদারঞ্জন রায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।ইনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি শার্লক হোমসের গল্পকে বাংলায় রূপ দিয়েছিলেন। গল্পগুলি দুখানি পুস্তকে সংকলিত হয়েছিল—'বাস্‌কারভিলের কুকুর' ও 'শার্লক হোমসের বিচিত্রকীর্তি' (প্রকাশকাল আনুমানিক ১৯৩২-৩৩)।

(দি হাউণ্ড অফ বাস্‌কারভিলের অনুবাদ করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও। 'জলার পেত্নী' নামে এঁর অনুবাদ 'মৌচাক' পত্রিকায় বার হয়েছিল।)

কুলদারঞ্জনবাবুর খেই ধরে নিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)। হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন চৌকস সাহিত্যিক। গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রহসন কবিতা, বিবিধ শিল্প সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিচিত্র সাহিত্য সাধনায় ইনি একদা ব্যাপৃত ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার পরিচালনায় হেমেন্দ্রকুমার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকা বন্ধ (১৯২৬) ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৯২৯) হলে পর হেমেন্দ্রকুমার জীবিকার জন্য ছেলেদের গল্প লিখতে থাকেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে তিনি পাঁচকড়ি দে'র অনুবর্তী হয়ে অন্তত একটি গল্প লিখেছিলেন সে কথা 'উপন্যাস সংগ্রহ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখন তিনি আবার ফিরে এলেন ডিটেকটিভ গল্পে এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত রসের কাহিনীতে। এইবার তাঁর আবির্ভাব হল ছেলেদের 'মৌচাক' পত্রিকায় (১৩৩০)। এ সবেরই বিষয় বা বস্তু ছিল বিলিতি। তবে হেমেন্দ্রকুমারের লেখনীতে বিদেশী বস্তু যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে দেশী রূপ ও রস প্রাপ্ত হয়েছিল। বিদেশী বস্তুকে আত্মসাৎ করার কৃতিত্বেই অলোচ্যকাল মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীর রচয়িতা। কৈশোরক সাহিত্যকে তিনি বয়স্কের উপভোগ্য করতে পেরেছিলেন।

বাংলা ডিটেকটিভ কাহিনীতে ইনি নূতনত্ব আমদানী করলেন দু'দিকে : (১) ডিটেকটিভ ভাবনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চার ; (২) 'ত্রিশূল' ডিকেটটিভ কল্পনা। ডিটেকটিভ ভাবনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহার ঘটেছিল তাঁর প্রচুর ইংরেজী ডিটেকটিভ কাহিনী পড়ার ফলে। (হেমেন্দ্রকুমার যে প্রচুর ইংরেজী ডিটেকটিভ বই পড়তেন সে কথা আমি বহুকাল আগেই শুনেছিলুম এক শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মীর কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধগণিত বিভাগের অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষ মহাশয় বাগবাজারে হেমেন্দ্রকুমারের প্রতিবেশী ছিলেন। মোহিতবাবু সবরকম রোমাঞ্চকর রহস্যকাহিনীর ও গোয়েন্দাগল্পের পরম ভক্ত ছিলেন। এঁর কাছ থেকেই হেমেন্দ্রকুমার বই নিয়ে পড়তেন।) এ বিষয়ে তাঁরই উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি 'জয়ন্তের কীর্তি' বইটির পরিশিষ্ট থেকে—

> 'যাঁরা 'জয়ন্তের কীর্তি' শেষ পর্যন্ত পড়বেন তাঁরা যে খালি গল্পের জন্যই পড়বেন, একথা জানি। কিন্তু 'জয়ন্তের কীর্তি'র মধ্যে গল্প ছাড়াও আর একটি যা লক্ষ্য করবার

বিষয় আছে তা হচ্ছে এই, এটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনী এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। এর আখ্যানবস্তু কাল্পনিক হলেও কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই তা কল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষের দেহকে জিইয়ে রেখে তাকে যে মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতে এটা ঔপন্যাসিকের অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু আসলে বহু পরীক্ষার পর আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা ঐ অভাবনীয় বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য, কি এদেশে ও কি পাশ্চাত্য দেশে, ঐ বিচিত্র তথ্য যা আবিষ্কার নিয়ে আজ পর্যন্ত উপন্যাস লেখবার কল্পনা আর কোনো লেখক করেছেন বলে জানি না।

তারপর, এই উপন্যাসের মধ্যে অপরাধীরা যে-সব নতুন উপায় অবলম্বন করেছে এবং জয়ন্ত যে-সব পদ্ধতিতে সেই-সব অপরাধ আবিষ্কার করেছে তাও আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানসম্মত। এ-দেশে ওরকম বৈজ্ঞানিক অপরাধী ও বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ এখনো আত্মপ্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকায় তারা যথেষ্ট সুলভ।

বৈজ্ঞানিক চোর, ডাকাত ও খুনেদের জ্বালায় ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পাশ্চাত্য পুলিশও এখন বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে পারে না। কথাসাহিত্যে বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস্ অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য পুলিশ তাঁর চেয়েও ঢের বেশি অগ্রসর হয়ে প্রমাণিত করেছে, বাস্তব জীবনের সত্য উপন্যাসের চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর।'

এর থেকে প্রতিপন্ন হবে লেখক হিসাবে হেমেন্দ্রকুমারের সততা আর গল্পকার হিসাবে মৌলিকতা।

'ত্রিশূল' ডিটেকটিভ মানে ডিটেকটিভ ও তাঁর দুই সাহায্যকারী। সাহায্যকারীদের একজন হলেন অন্তরঙ্গ সহচর, আরেকজন হলেন সহায়ক পুলিশ কর্মচারী। হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দাকাহিনীগুলিতে দু সেট 'ত্রিশূল' ডিটেকটিভ পাওয়া যায়। অধিকাংশ বইয়ে পাই ডিটেকটিভ জয়ন্ত, সহচর মাণিক, পৃষ্ঠপোষক ইন্‌সপেক্টর সুন্দরবাবু। চারখানি বইয়ে ডিটেকটিভের নাম হেমন্ত, সহচরের নাম রবিন, পৃষ্ঠপোষক ইন্‌সপেক্টর সতীশবাবু। প্রথম সেটের গ্রন্থসংখ্যা খান দশ/বারোর বেশি হবে না। যেমন—'জয়ন্তের কীর্তি', 'মানুষ পিশাচ', 'শনিমঙ্গলের রহস্য', 'সাজাহানের ময়ূর', 'পদ্মরাগ বুদ্ধ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সেটের চারটি গ্রন্থ বেরিয়েছিল দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজে—'অন্ধকারে বন্ধু' (সিরিজের প্রথম বই), 'রাত্রির যাত্রী', 'মুখ আর মুখোস' এবং 'বিভীষণের জাগরণ' (সিরিজের উনবিংশ গ্রন্থ)। এই চারখানি বই আগে লেখা হয়েছিল।

('ত্রিশূল' ডিটেকটিভের এই নামবদলের কারণ কী জানতে পাঠক উৎসুক হতে পারেন। মনে হয় কারণ আর কিছু নয়, ঘটনার রূপ রস নিয়ে। প্রথম সেটের কাহিনীগুলিতে অলৌকিকের কাছঘেঁষা অসম্ভবত্ব আছে, বিভীষিকা আছে, রোমহর্ষক এ্যাডভেঞ্চার আছে। দ্বিতীয় সেটের কাহিনীতে এ সব নেই, আছে গোয়েন্দাগিরির চাতুর্য। ঘটনার স্বরূপে বিভিন্নতা থাকার জন্যই হেমেন্দ্রকুমার ডিটেকটিভের ভিন্নতা করেছেন।)

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি ঠনঠনে, ঝামাপুকুরের বিখ্যাত অর্থ-পুস্তক প্রকাশক আশুতোষ দেব এ্যাণ্ড সন্স নাম বদল করে দেব সাহিত্য কুটীর হয়ে কিশোরপাঠ্য বই প্রকাশ শুরু

করেছিল। বইগুলির মধ্যে এ্যাডভেঞ্চার, অলৌকিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীও ছিল। গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি বেরিয়েছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কয়েকটি সচিত্র অ-চিত্র সিরিজে। এই সিরিজগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ। চব্বিশখানি বই বেরিয়েছিল। এর মধ্যে এগারোটি গোয়েন্দা-কাহিনী। সেগুলির লেখক-লেখিকা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক : হেমেন্দ্রকুমার রায় (চারখানি), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (দুখানি), বুদ্ধদেব বসু (দুখানি),নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (একখানি), প্রভাবতী দেবী (একখানি), শৈলবালা ঘোষজায়া (একখানি)।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চৌকস সাহিত্যিক ছিলেন। ইংরেজী অনুবাদে এঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গোয়েন্দা-কাহিনী দুটি ইংরেজী মূল অবলম্বনে রচিত নিশ্চয়ই। তবে বিষয়বস্তু উপন্যস্ত হয়েছে পরিচ্ছন্ন দেশীয় পরিবেশে। একটির ঘটনাস্থল রাঁচি অঞ্চল, অপরটির কলিকাতার উপকণ্ঠ। এই দুটি গল্পের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। প্রথমটি বিলিতি ধরনের, দ্বিতীয়টি দেশী ধরনের। গল্প দুটির হুনুর ইউনিভার্সিটিতে পড়া ভালো ছেলে, অসমসাহসী দেশভক্ত ও সত্যান্বেষী। বিনয় ঠিক গোয়েন্দা নন, তবে গোয়েন্দার কাজ করতে হয়েছে ঘটনাচক্রে পড়ে। ঝরঝরে লেখা, বেশ সুপাঠ্য। বই দুটির নাম—'বিজয় অভিযান' ও 'উদাসীবাবার আখড়া'।

কবি, গল্প-উপন্যাস লেখক ও প্রবন্ধরচয়িতা হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এঁর গোয়েন্দা কাহিনী দুখানির নাম 'ছায়া কালো কালো' ও 'ভূতের মতো অদ্ভুত'। কাহিনী দুটির ঘটনাস্থল কলিকাতা ও উপকণ্ঠ। বই দুখানিতে এ্যামেচার হাফ গোয়েন্দা হলেন সংবাদপত্রসেবী চঞ্চল। তবে শেষ রক্ষা করেছে পুলিশ। রচনা খুবই পরিচ্ছন্ন। কাহিনী দুটির বস্তু মনে হয় এডোয়ার্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলির রচনা থেকে নেওয়া। চঞ্চল চরিত্রটিতে বেন্টলির Trent চরিত্রের অনুকরণ, তাতে সন্দেহ নেই।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন একাধারে বিদগ্ধ আইনজ্ঞ, অধ্যাপক ও আইনজীবী এবং সুসাহিত্যিক। বাংলা উপন্যাসে যৌনসমস্যার ও ক্রিমিন্যাল তত্ত্বের ভারি মশলা নরেশচন্দ্রই প্রথম জুগিয়ে ছিলেন (দ্রষ্টব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩২৭)। নরেশচন্দ্রের গোয়েন্দা কাহিনীটি একটি বড়ো গল্প। স্বচ্ছন্দ রচনা, অতিশয় সুপাঠ্য। কাহিনী বিদেশী বলে চেনা শক্ত। বইটির নাম 'হারানো বই'।

প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী) প্রচুর পাঠকপ্রিয় গল্প উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে এঁর বই দুখানি হল 'গুপ্তঘাতক' ও 'হত্যার প্রতিশোধ'। তাছাড়া দেব সাহিত্য কুটীর থেকে কৃষ্ণা সিরিজ নামে এঁর আরো সাতখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাবতীর নয়খানি গ্রন্থে হবু গোয়েন্দা ও গোয়েন্দা একটি বাঙালীর মেয়ে, নাম কৃষ্ণা। দুপুরুষ পুলিশ কর্মচারীর মেয়ে। এঁর কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল হচ্ছে বর্মা ও বাংলাদেশের সংলগ্ন অঞ্চল। প্রভাবতী দেবীর বইগুলি বিশেষ অভিনবত্ব মেয়ে-গোয়েন্দার প্রবর্তন। কৃষ্ণা সিরিজের বইগুলির নাম 'কারাগারে কৃষ্ণা', 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার অভিযান', 'কৃষ্ণার পরিচয়', 'বনেজঙ্গলে কৃষ্ণা', 'মুক্তিপথে কৃষ্ণা' ও 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'।

শৈলবালা ঘোষজায়া বাঙালী মহিলা গল্প-উপন্যাস লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ

লেখিকা। এঁর গোয়েন্দা কাহিনীটির নাম 'জয়পতাকা'। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় কাঠামোয় সাজানো বেশ সুপাঠ্য ক্রাইম কাহিনী।

বোধ করি শৈলবালার প্রভাবেই বাঙালী মুসলমান মেয়েকে ডিটেকটিভ গল্প লিখে প্রকাশ করতে দেখি। শ্রীরামপুর থেকে ১৯২৯ সালে উপন্যাসলেখিকা নুরুন্নেছা খাতুনের কন্যা কামরুন্নেছা খাতুন ওরফে পান্না বেগমের ক্ষুদ্র ডিটেকটিভ উপন্যাস 'গাঙ্গুলিমশায়ের সংসার'। বলা বাহুল্য নিতান্ত কাঁচা লেখা।

এ পর্যন্ত যাঁদের ক্রাইম ও গোয়েন্দা কাহিনী আলোচিত হয়েছে প্রায় সবাই অন্য রচনায় হাত পাকিয়ে তবে ক্রাইম ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এখন যে দুজন লেখকের কথা বলছি তাঁরা যতদূর জানি ক্রাইম ও গোয়েন্দা কাহিনী নিয়েই লিখতে শুরু করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র (জন্ম ১৯০৮) ক্রাইম ও গোয়েন্দা কাহিনী দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন বটে তবে হাত পাকিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সাধারণ গল্প-উপন্যাস লিখেই। তবে গোয়েন্দা কাহিনী লেখা শেষ পর্যন্ত একেবারে ছাড়েননি। এঁর প্রথম রচনা বিশ বছর বয়সে লেখা 'রেশমী ফাঁস' বেরিয়েছিল কালিকা প্রেস প্রকাশিত ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত রহস্যচক্র সিরিজে। বছর দুই পরে এঁর বই বেরিয়েছিল 'শমনসভার কীর্তি' আর 'কাটামুণ্ডর কারসাজি' কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে। গজেন্দ্রবাবুর শেষ দুখানি বই হল 'তৃতীয় রিপু' ও 'হায়নার দাঁত'।

মাঝখানে ইনি কতকগুলি গোয়েন্দা গল্প লিখে বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১০-১৯৮৬) ক্রাইম ও গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে লিখতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাইই লিখে গেছেন। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসাবে নীহাররঞ্জনের অনন্যতা হল ইনি বাঙালী গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের মধ্যে বোধ করি একমাত্র মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তার। ডাক্তারি পাশ করে নীহাররঞ্জন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে পর চাকরিসূত্রে বর্মায় গিয়েছিলেন। গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে এঁর প্রবৃত্তি হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে। ইনি বহু গোয়েন্দা কাহিনী লিখে গেছেন। সংখ্যায় প্রায় সত্তর/পঁচাত্তর। এঁর কাহিনী সিরিজের ডিটেকটিভের নাম কিরীটি রায় আর তাঁর সহকারী সুব্রত রায়। নীহাররঞ্জনের জনপ্রিয়তা বোধ করি হেমেন্দ্রকুমারকেও অতিক্রম করেছিল। এঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির নাম করছি—'বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল' (১৩৪৬), 'রক্তলোভী নিশাচর' (১৩৪৯), 'আঁধার পথের যাত্রী' (১৩৫০), 'ডাইনীর বাঁশি' (১৩৫০), 'ড্রাগন' (১৩৫২), 'মরণের মুখোমুখি' (১৩৫২), 'মরণের হাতছানি' (১৩৫২), 'মারণ ভোমরা' (১৯৪৫), 'রক্তহীরা' (১৩৫৩), 'অদৃশ্য কালো হাত' (১৩৫৩), 'নেকড়ের থাবা' (১৩৫৩), 'মৃত্যুবাণ' (৩য় সং, ১৩৫৫), 'কালো পাঞ্জা' (১৩৫৫), 'কালোছায়া' (১ম-৪র্থ খণ্ড ১৩৫৫-৫৭), 'অদৃশ্য শত্রু', 'কালনাগ', 'অভিশপ্ত পুঁথি', 'নাগপাশ' (২য়, ১৩৫৬), 'সীমান্তছায়া' (১৩৫৭), 'ছিন্নমস্তার খড়্গ', 'বিষের তীর' (১৩৫৮), 'দুঃস্বপ্ন' (১৩৫৯) ইত্যাদি। 'মৃত্যুবাণ' উপন্যাসটি বাস্তব ঘটনা নিয়ে লেখা।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গেই বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখক হিসাবে নাম করতে হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০)। শরদিন্দু বিহারের মানুষ। তাঁর পিতা মুঙ্গেরে

ওকালতি করতেন। তাঁর ইস্কুলে পড়া মুঙ্গেরে, কলেজে পড়া কলকাতায়, আইন পড়া পাটনায়। আইন ব্যবসায়ে শরদিন্দুর মন বসেনি। তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন এবং কিছুকাল পরেই বম্বে চলে যান সিনারিও লেখার কাজ করতে। সেইখানেই তিনি স্থিত হন। গদ্য পদ্য রচনায় শরদিন্দু প্রথম থেকেই বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি বিশেষ উপভোগ্য। ঐতিহাসিক গল্প রচনা করে তিনি সাহিত্যে নূতনত্বের সঞ্চার করেছিলেন। বিলাতি ডিটেকটিভ কাহিনী পড়তে ভালোবাসতেন শরদিন্দু। কোনান ডয়েলের অনুসরণে ইনি ডিটেকটিভ গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন ১৩৩৯ সালে। তাঁর প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা' বেরিয়েছিল বসুমতী পত্রিকায় (৭ আষাঢ় ১৩৩৯)। তারপর তিনি নয়টি গল্প লিখেছিলেন—'সীমন্তহীরা', 'সত্যান্বেষী', 'মাকড়সার রস', 'অথমনর্থম্', 'চোরাবালি', 'অগ্নিবাণ', 'উপসংহার', 'রক্তমুখী নীলা', 'ব্যোমকেশ ও বরদা' (১৩৪৩)। গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল এই তিনটি বইয়ে : 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' (১৩৪০) 'ব্যোমকেশের কাহিনী' (১৩৪০), 'ব্যোমকেশের গল্প' (১৩৪৪)। অতঃপর দীর্ঘকাল শরদিন্দু ডিটেকটিভ গল্প লেখেননি। আবার আরম্ভ করেছিলেন ১৩৫৮ থেকে। এই দ্বিতীয় স্তরের প্রথম গল্প হল 'চিত্রচোর' (১৩৫৮)। শেষ গল্প 'বিশুপাল বধ' (১৯৭০) অসমাপ্ত। দ্বিতীয় স্তরের গল্পগুলি বাংলা ক্রাইম-কাহিনীর মোড় ফিরিয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গল্প ও কাহিনীতে ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী ও তাঁর সহায়ক বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস্ ও ডাঃ ওয়াট্সনের প্রতিফলন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শার্লক হোমসের কাহিনী: অবলম্বন করে গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁর মৌলিকত্বের এক প্রধান অঙ্গ ছিল তাঁর লিখনভঙ্গি এবং নানা বিষয়ের অবতারণা। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চতুর্থ খণ্ডে যা লিখেছি উদ্ধৃত করি:

> 'ভূতের গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, ঐতিহাসিক গল্প এবং নাট্যচিত্র লেখায়ও ইনি অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভৌতিক এবং ডিটেকটিভ গল্পে ইহার দক্ষতা ইংরেজী গল্পের প্রায় সমতুল্য। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল অনায়াসসুন্দর সহজ ও স্বচ্ছ রচনারীতির মনোহর আদর্শ। যে গুণ থাকিলে অনাড়ম্বর রচনা কালের সম্মার্জনীর স্পর্শ এড়াইতে পারে সে গুণ শরদিন্দুবাবুর অনেক গল্পে বিদ্যমান।'

আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিতে হয়। তার কারণ শুধুই কাহিনীর গঠনের ও বর্ণনার ওপর নির্ভর করে না। অন্য কারণও আছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গৌরব তিনি বাংলা কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনীকে বয়স্কপাঠ্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌরব এইখানে যে তিনি গোয়েন্দা কাহিনীকে সাধারণ উপন্যাসের মর্যাদায় তুলেছিলেন। এমন কথা বলি না যে শরদিন্দুবাবুর শ্রেষ্ঠ কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক। তবে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে বিলাতি ডিটেকটিভ সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল এবং সে অধিকার তিনি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একটা উদাহরণ দিই। শেষের দিকে শরদিন্দু তাঁর কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যোমকেশের জীবনের কথাও বলে যেতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর এ সব কাহিনীগুলিতে গোয়েন্দাও যেন কাহিনীর একটি চলমান চরিত্র। এ কৌশলটুকুর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি 'মাইকেল ইনেস' ছদ্মনামী John Innes Mackintosh Stewart-এর গ্রন্থাবলী থেকে॥

ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি

সুকুমার সেন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৮

প্রচ্ছদ অনুপ রায়

ISBN 81-7066-147-1

© সুনৃতাবরী সেন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ২৫·০০